নাচনী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৬৭

NAACHNI

A Bengali novel

By

Nimai Bhattacharyya

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও উপেন্দ্র প্রিণ্টিং প্রেস, ১৬ ভীম ঘোষ লেন,
কলিকাতা ৬ হইতে সত্যহরি পান কর্তৃক মুদ্রিত

পরম শ্রদ্ধেয়

কবি শ্রীহংসকুমার তেওয়ারীকে

নাচনী

লখনৌতে বেড়াতে গিয়েই সব ওলট-পালট হয়ে গেল। অথচ আমি ওলট-পালট করে দেবার মত ছেলে নই। বাবা-মা যখন যা বলেছেন আমি জাপানী পুতুলের মত ঠিক তাই করেছি।

অনেকে, বিশেষ করে মেডিক্যাল কলেজের সতীর্থরা আমাকে বোকা ভাবে। ভাবে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমার নেই, ভবিষ্যত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার বুদ্ধি বা মনের বলও আমার নেই। ওরা যা ইচ্ছে তাই ভাবুক। আমি ওদের সমর্থনও করি না, প্রতিবাদও করি না! শুধু হাসি।

আমার হাসি দেখে অসিত রেগে যায়। পর পর দু'তিনবার সিগারেটে টান দিয়ে বলে, তোর এই হাসিটা আমি সহ্য করতে পারি না।

আমি তখনও হাসি। জিজ্ঞাসা করি কেন রে?

নিজের সম্পর্কে এতটা নির্বিকার থাকতে তোর পৌরুষে লাগে না?

অসিত যতই রাগ করুক, হাসি আমার থামে না। বলি দ্যাখ, ইলিশ মাছের মত এসব বীরত্ব আর অহঙ্কারের মেয়াদ কতক্ষণ রে? শেষ পর্যন্ত তো সেই ঝোল-ঝাল-ভাজা!

তার মানে?

ডাক্তারী পাশ করে ভেবেছিস তোরা পুঁটি বা কুচো চিংড়ি না, অ্যারিস্টোক্রাট ইলিশ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ পুঁটি আর ইলিশের একই পরিণতি।

অসিত আমার যুক্তি মানতে চায় না। বলে, তুই একটা হোপলেস। এক কথায় একটা অকর্মণ্য।

অন্য কেউ হলে ওর কথায় রাগ করত, অপমান বোধ করত, প্রতিবাদও করত। আমি করি না। হাসতে হাসতে বলি, দ্যাখ অসিত, যে দেশে, যে সমাজে আমরা জন্মেছি, বাস করছি, সেখানে এসব উচ্ছ্বাস বা স্বপ্নের কতটুকু মেয়াদ বলতে পারিস?

যে যাই বলুক, নিজের সম্পর্কে বেশি ভাবনা-চিন্তা করতে আমার ভাল লাগে না। দাবী না করে যেটুকু পাওয়া যায় তাতেই আমার মন ভরে যায়, তাতেই আমি খুশি। তাছাড়া সবাই কালবৈশাখীর মত নিজেকে নিয়ে তর্জন-গর্জন করতে পারে না। নিঃশব্দে শরতের আগমন হয় বলে কি তার সৌন্দর্য বা মূল্য কম? কেন শিউলি? শেষরাতের অন্ধকারে শিশিরের সঙ্গে সঙ্গে চুপি চুপি মাটিতে ঝরে পড়ে বলে কি তার গন্ধ, মাদকতা হারিয়ে যায়?

অসিত বলে, তুই ডাক্তার না হয়ে পোর্ট কমিশনারের কেরানী হলি না কেন?

পোর্ট কমিশনারের কেরানী হলেও আমি মুখের হাসি হারাতাম না।

বিশ্বজিৎ ডাক্তার হয়েও রাজনীতি করে। ও ঠাট্টা করে আমাকে বলত, তুই হিন্দু মহাসভায় জয়েন কর্।

আমি কোন মহাসভাতেই জয়েন করিনি, করব না। এই পৃথিবীতে সবাই বিদ্রোহ করতে পারে না। আমি রেল লাইন ধরে বেশ চলছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওলট-পালট হয়ে গেল। নিজের জীবন নিয়ে এমন জিমন্যাস্টিক দেখাবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা, কোনটাই আমার ছিল না, এখনও নেই। তবু ঘটে গেল। শরতের আকাশেও কখনও কখনও মেঘের ঘনঘটা দেখা যায়, বিদ্যুৎ চমকায়।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার মত ঠিক নিয়ম-মাফিক দিনগুলো কাটছিল। হঠাৎ বিজু এসে হাজির হল। বিজু ডাক্তার না, পেসেন্টও না। ও আমার বাল্যবন্ধু। চিৎকার করে বলতে পারব না—সে সাহস আমার নেই, কিন্তু মনে মনে জানি বিজু ছাড়া আমার আর কোন বন্ধু নেই। আমার সমস্ত দোষ-গুণ মেনে নিয়ে, সহ্য করে, ওর মত আর কেউ আমাকে এমন ভাবে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে না।

অথচ ওর সঙ্গে আমার কোন মিল নেই। চেহারায়, স্বভাব-চরিত্রে, কোন দিক থেকেই নয়। ও একটা ডানপিটে দস্যু, এক

নম্বরের বাতিকগ্রস্ত। কখন যে কি করবে তার ঠিকঠিকানা নেই। এই তো কয়েক বছর আগেকার কথা। রূপবাণীতে সিনেমা দেখতে গিয়ে কি কাণ্ডটাই করল! আমাকে লাখ টাকা দিলেও আমার দ্বারা ও কাজ হত না। মেরে ফেললেও না।

তখনও সিনেমা আরম্ভ হতে দেরি আছে। আমরা চিনেবাদাম চিবুতে চিবুতে গল্প করছি। আমাদের ঠিক সামনে তিন-চারটে মেয়ে খুব বকবক করছিল। ও হঠাৎ একটা মেয়েকে দেখিয়ে বলল, মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করতে পারিস?

না।

দশটা টাকা দেব।

হাজার টাকা, লাখ টাকা দিলেও না।

যদি আমি পারি?

তোর ফিক্স করা রেট দশ টাকাই পাবি।

ঠিক দিবি তো?

অ্যাডভান্স চাস?

না না, অ্যাডভান্স নেব কেন? নিজের কর্মদক্ষতায় রোজগার করব।

আমি জানতাম বিজুর দ্বারা সব কিছুই সম্ভব। এ ধরনের বীরত্বের পরিচয় ও বহুবার দিয়েছে, তবু আরেকবার বীরত্ব দেখাবার সুযোগ না দিয়ে পারলাম না। হলের আলো একটু স্তিমিত হবার পরই বিজু সামনের সারির একটি মেয়ের কাঁধে আলতো করে হাত দিয়েই বলল, কি রে মায়াদি! তুইও এসেছিস?

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে বলল, আমি মায়াদি না।

সরি!

আমি দশ টাকার নোট বের করেছিলাম কিন্তু বিজু নিল না। বলল, এ তো পাঁচ টাকার কাজ করলাম। আরো পাঁচ টাকার কাজ করি, তারপর নেব।

এই হচ্ছে বিজু! সব কিছুতেই ওর সততার মানদণ্ড অন্যান্য আর পাঁচজনের চাইতে একটু উঁচু।

ইন্টারভ্যালের সময় চা খাবার সময় ঐ মেয়েটিকে দেখেই বিজু এগিয়ে গেল। খুব সহজ সরল ভাবে হাসতে হাসতে বলল, জানো মায়াদি, ঠিক তোমার মত একটা মেয়ে আমাদের সামনের সীটে বসেছে আর আমি তাকে ··

মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, আমিই আপনার সামনের সীটে বসেছি !

ন্যাকা সেজে বিজু বলল, আপনি তাহলে মায়াদি না ?

না।

কিন্তু ঠিক এক রকম···

চায়ের কাপ ফেরত দেবার জন্য মেয়েটি ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে যেতেই বিজু ওর হাত থেকে কাপটা নিয়ে বলল, ভিড়ের মধ্যে যাবেন না। আমি দিয়ে দিচ্ছি। বলে শুধু কাপ নয়, চায়ের দামটাও বিজু দিয়ে দিল।

এ কি ? আপনি চায়ের দাম দিলেন কেন ?

চায়ের দোকানের সামনের ভিড় থেকে সরে আসতে আসতে ও বলল, বেনারসী শাড়ি তো কিনে দিলাম না, দিলাম এক কাপ চায়ের দাম। তার জন্য ·চলুন, চলুন, বই শুরু হয়ে যাবে।

কিন্তু···

অত কিন্তু-কিন্তু মনে হলে বই শেষ হবার পর এক কাপ চা খাইয়ে দেবেন।

ঠিক আছে।

আমি দশ টাকার নোটটা বের করতেই বিজু আমার পকেটে পুরে দিয়ে বলল, সাড়ে সাত টাকার কাজ হল। আরো আড়াই টাকার কাজ হলে পরে দিস।

বিজু আমার অ্যান্টি-থিসিস। সব ব্যাপারেই। এমন কি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও। ও দারুণ ঝাল খেতে পারে, আমি ঝাল সহ্য করতে পারি না। ও যে-কোন ব্যাপারেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, পড়ে, আমি নিজের ব্যাপারেও কোন উৎসাহ বোধ করি না। বিশ্ব-

সংসারের সব ব্যাপারে ওর আগ্রহ আছে, আর আমার কোন ব্যাপারেই আগ্রহও নেই, অনীহাও নেই। তবু বিজু আমার একমাত্র বন্ধু। আমার জন্য ও নিঃশব্দে বুক চিরে রক্ত দিতে পারে। আসলে ওর মনটা সমুদ্রের মতন। জোয়ারের সময় জানা-অজানা সব নদী-নালায় নিজের ঐশ্বর্য বিলিয়ে দিতে পারে। ভাঁটার টানে সবার দুঃখ নিজের বুকে তুলে নিতেও পারে। আর আমি? আমি একটা খানা-ডোবা। সমুদ্রের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হবার কথা নয় কিন্তু সমুদ্র-সন্নিকটে থেকে তার মহত্ত্বের, ঐশ্বর্যের স্বাদ পাই বার বার।

মিল শুধু নামে। ও বিজয়, আমি অজয়। বিজু আর অজু। পাশাপাশি বাড়িতে দুটি পরিবারের মধ্যে হৃদ্যতা থাকলে যা হয়, সেই আর কি! এই পৃথিবীতে ও আগে এসে বিজয় হল, আমি এক বছর পরে এসে অজয় হলাম। ওর ছোট বোনের নাম বীণা, আমার ছোট বোনের নাম মীনা। এত বড় বিশ্বসংসারে শুধু এইটুকু মূলধন নিয়েই আমরা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছি। রেল কোম্পানির সেবা করতে গিয়ে দুটি পরিবার ছিটকে পড়েছে বহু দূরে কিন্তু তবুও হৃদ্যতা বা উষ্ণতার অভাব নেই আমাদের মধ্যে।

বিজু যে কখন কি করছে, তার খবর আমি রাখি না। রাখা সম্ভব নয়। বোধ হয় ও নিজেও জানে না। খুব ভাল ভাবে এম. এ. পাস করার পরই ওর চিঠি পেলাম—পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পুরনো অধ্যাপক ডক্টর মিশ্র আমাকে লেকচারার করে নিয়েছেন। ভেবেছিলাম বেকার থাকার সুযোগে আরো দু-এক বছর বাপের হোটেলের অন্ন ধ্বংস করে একটু উড়ে বেড়াব কিন্তু তা আর হল না। এসব চাকরি-বাকরির বন্ধন আর ভাল লাগে না। তবে সুন্দরী ছাত্রীদের মধ্যে আমার জনপ্রিয়তা দেখে সব দুঃখ ভুলে গেছি।

বছরখানেক পরে বিজু জনা-দশেক ছাত্র আর ছ-সাতজন ছাত্রীকে নিয়ে এডুকেশন্যাল ট্যুরে বেরিয়ে উড়িষ্যা থেকে ফেরার পথে কলকাতা এসে হাজির। নিজের পকেট থেকে খরচ করে সব ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আমাকে নিয়ে মেট্রোয় সিনেমা দেখতে গেল। আমার সঙ্গে সবার

আলাপ করিয়ে দেবার পর ফিস ফিস করে বলল, মালা আমাকে দারুণ ভালবাসে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

মাসীমা-মেসোমশাই জানেন ?

পুরোপুরি না জানলেও অনেকটা জানেন।

কি করে ?

এ-নোটস্, সে-নোটস্ নেবার অজুহাতে যখন-তখন আমাদের বাড়িতে যায়।

তারপর ?

তারপর আর কি ? আমার ঘরে বসে নোটস্ দিতে দিতে একটু-আধটু আদর করে দিই।

মালা কিছু বলে না ?

কি বলবে ? ও তো ঐ আদরটুকু পাবার জন্যই আসে।

তুই ওদের বাড়িতে যাস ?

জরুর।

ইউনিভার্সিটির লেকচারার হয়ে ছাত্রীর বাড়ি যেতে তোর লজ্জা করে না ?

নোটস্-এর খাতা নিয়ে গেলে আমি কি করব ? সিনেমা হলের অন্ধকারের মধ্যেও বিজুর আত্মপ্রসাদের হাসিটুকু আমি দেখতে পেলাম।—তাছাড়া ওদের বাড়িতে আমার প্রেস্টিজই আলাদা।

কেন ? মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছিস বলে ?

ওসব তুই বুঝবি না। একবার এলাহাবাদ এসে নিজের চোখে দেখে যা।

ওসব তোদের এলাহাবাদেই সম্ভব। কলকাতায় হলে ঠ্যাঙানি খেয়ে-মরতিস।

বিজু হাসল। বলল, এই সব সুবিধে নেই বলেই তো কলকাতায় থাকি না।

ঠিক তিন-চার মাস পরেই পুণা থেকে বিজুর চিঠিতে জানলাম ব্যাঙ্গালোর থেকে বোম্বে আসার পথে শিবানী ইন্দুরকার নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং তারই আগ্রহে পুণা ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করা শুরু করেছে।

আমি চিঠিপত্র লিখি না। একেবারেই অভ্যাস নেই। তবু এই চিঠি পাবার পর না লিখে পারলাম না।—আমি জানতাম তুই মালা বদল করবিই। পরবর্তী আকর্ষণের ঘোষণা জানার আগ্রহে বসে রইলাম।

বেশ কিছুকাল ডুব দিয়ে থাকার পর আবার বিজুর চিঠি এল। সঙ্গে একটা ফটো। ফটোটা দেখে ভাবলাম বোধ হয় শিবানীর সঙ্গে ওর ছবি। চিঠিটা পড়তে গিয়েই দেখি, না, স্থান দুর্গাপুর। শ্রেষ্ঠাংশে বিজয়কুমার ও বেলা সরকার। এ ছবির নায়ক এলাহাবাদের অধ্যাপক বা পুণার গবেষক নয়। ব্যবসাদার। বিজনেসম্যান।

বিজু ব্যবসা করছে? ঐ পাগলা কি ব্যবসা করবে? অমন উড়নচণ্ডী, বেহিসেবী ছেলে ব্যবসা করবে?

আমি জানি তুই শুনে হাসবি, কিন্তু দেখে নিস একদিন তোর বিজু ব্যবসা করে সারা দেশকে চমকে দেবে। সেদিন ইথিওপিয়ার এম্পারার হাইলে সেলাসী বিড়লার বদলে আমাকে ইণ্ডাস্ট্রি খোলার জন্য অনুরোধ করলেও সৌদি আরবের তেলের ব্যবসা সামলাতে এত ব্যস্ত থাকব যে হাইলে সেলাসীর চিঠির জবাব দেবারও আমার সময় থাকবে না।

মনে মনে প্রশ্ন করি, তুই হঠাৎ শিবানীর মালার মোহ ত্যাগ করে অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যবসা-বাণিজ্যের বেলাভূমিতে হাজির হলি কি করে?

ভাবছিস টিচিং লাইন ছেড়ে এ লাইনে এলাম কি ভাবে? ইট ইজ অল বিকজ অফ বেলা'জ ফাদার। হি ইজ এ গ্রেট ম্যান। নাম করা এঞ্জিনীয়ার। বুদ্ধিমান, অনেস্ট, ইয়াং ছেলেদের সাহায্য করেই ওঁর আনন্দ। ওঁরই ফার্মে পার্টনার হয়ে কাজ করছি। তবে

কাকাবাবু বলেছেন এক বছর পরেই আমাকে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা শুরু করতে হবে।

আবার প্রশ্ন আসে মনের মধ্যে, রাজত্বের সঙ্গে রাজকন্যা জুটল, নাকি রাজকন্যার জন্য রাজত্ব পেলি?

কাকাবাবু ওয়েস্টার্ন রেলের ডিভিশন্যাল মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার ছিলেন। কাকাবাবুর ছেলে মানসের সঙ্গে পুণাতেই আমার আলাপ হয়। তারপর আস্তে আস্তে কাকাবাবু, কাকিমা ও বেলার সঙ্গে আলাপ। পুণা থেকে বোম্বে গেলে ওদের ওখানেই থাকতাম। মাঝে মাঝে বেলার অনার্স পেপারটা বুঝিয়ে দিতাম। বিশ্বাস কর্ অজু, বেলার মত কেউ আমাকে ভালবাসতে পারবে না। তাছাড়া···

ওর চিঠি পড়তে পড়তে আমার হাসি পায়। আলমারি থেকে যদি ওর পুরনো চিঠিগুলো বের করি তাহলে দেখব মালা বা শিবানী সম্পর্কেও ঠিক একই কথা। যত ভাবি চিঠি লিখব না কিন্তু বিজু এমন এক-একটা খবর দিয়ে চিঠি দেয় যে আমাকে চিঠি লিখতেই হয়। —তুই কি অর্জুনের মত ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যে এক-একটি চিত্রাঙ্গদা রাখতে চাস? তুই এবার বিয়ে কর্।

বিয়ে? আমার চিঠি পেয়েই বিজু আর চুপ করে থাকতে পারে না—বিয়ে করার সময় কই? বিয়ের জন্য অন্তত তিনটে দিন চাই। বিয়ে, বাসীবিয়ে, ফুলশয্যা। ঐ তিনদিনে নতুন ভারত গড়ে তোলার তিনজন কারিগর, তিনজন এঞ্জিনীয়ারের পকেটে তিন হাজার টাকা গুঁজে দিতে পারলে কমসে কম তিরিশ হাজার টাকা আমার পকেটে আসবে।

মালা আর শিবানীর মত একদিন বেলাও গেল, কিন্তু ব্যবসা করার নেশা গেল না। এলাহাবাদ, পুণা, দুর্গাপুর ঘুরে বিজু লখনৌতে ব্যবসা শুরু করল। লখনৌতে ব্যবসা জমে ওঠার পর ও হঠাৎ কি একটা কাজে কলকাতায় এসে ফিরে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেল। আপত্তি করলাম না। আপত্তি করলেও ও শুনত না।

ক'টা দিন সত্যিই খুব আনন্দে কাটালাম। মাসীমা, মেসোমশাই

খুব আদর-যত্ন করলেন। বীণার শুধু একই প্রশ্ন, মীনুকে কেন নিয়ে এলে না সেই কথা বল! মীনুকে না নিয়ে যাবার জন্য একটু রাগ করলেও এতদিন পরে আমাকে দেখেও কম খুশি হল না। আসার দিন বিজুর সঙ্গে বীণাও লখনৌ স্টেশনে এসে আমাকে পাঞ্জাব মেলে চড়িয়ে দিল।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমরা তিনজনে কথাবার্তা বলছিলাম। একবার বীণাকে বললাম, মাসীমা-মেসোমশাইকে বলে বিজুর বিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।

শুধু দাদার কেন, তোমার ব্যবস্থা করতে হবে না?

আমার ব্যবস্থা হয়ে আছে।

বীণা সঙ্গে সঙ্গে বিজুকে জিজ্ঞাসা করল, তাই নাকি দাদা?

বিজু সিগারেট টানতে টানতে বলল, আরে দূর! ও নিজের ব্যবস্থা করবে!

ফোর বার্থ ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট। সস্ত্রীক একজন আর্মি অফিসার ছাড়া একজন বিদেশিনী মহিলা ও আমিই যাচ্ছি। বিদেশিনীর পাশে বসতে গিয়ে ওর সাদা পোশাকের ওপর রেডক্রশের চিহ্ন দেখেই বুঝলাম উনি নার্স। সুন্দর সৌম্য চেহারা। যুবতী কিন্তু একটু মোটা। পাশে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই উনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইউ আর ডক্টর সরকার?

ছাটস্ রাইট।

হাত এগিয়ে দিয়ে পরিষ্কার বাংলায় নিজের পরিচয় দিলেন, আমি সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্।

বিদেশিনী ভদ্রমহিলার মুখে বাংলা কথা শুনে সত্যি অবাক হলাম, বাঃ! আপনি তো সুন্দর বাংলা বলেন!

সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ হাসলেন। বললেন, অনেকদিন আপনাদের দেশে আছি যে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। আপনাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলেই আছি বছর ছয়েক আর ইণ্ডিয়ায় প্রায় আট বছর হল।

সামনের বার্থের আর্মি অফিসারটিও আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, ডক্টর, আই অ্যাম কর্নেল চাওলা।

সঙ্গে সঙ্গেই হ্যাণ্ডসেক করলাম।

কর্নেল চাওলা ওঁর স্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, মাই ওয়াইফ মীনা।

আমি হাত জোড় করে নমস্কার করতে করতে বললাম, মাই সিস্টার্স নেম ইজ অলসো মীনা।

কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে বললেন, দেন ইউ মাস্ট ট্রিট মী অ্যাজ ইওর ব্রাদার-ইন-ল !

কম্পার্টমেণ্টের চারজন হো হো করে হেসে উঠলাম।

ট্রেনটা ছাড়ার পর ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিলাম আর আস্তে আস্তে বিজু আর বীণার চেহারাটা ঝাপসা হয়ে যেতে যেতে হারিয়ে গেল। তবুও দরজার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কম্পার্টমেণ্টের ভিতরে যেতেও ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু আসতেই হল। কতক্ষণ আর দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকব! ভাগ্যক্রমে সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ আর কর্নেল দম্পতিকে পেয়ে বিষণ্ণ মন প্রসন্ন না হয়ে পারল না।

আমি সত্যিই বাইরে বেরুতে চাই না। নিজের ইচ্ছায় বা উদ্যমে কখনই কোথাও যাই না। কেউ জোর করে টেনে না নিয়ে গেলে যাই না। যখন যাই, বাইরের পৃথিবীর মুক্ত আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়াই, তখন সত্যি ভাল লাগে। প্রাণ ভরে, বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে নিজেকে বড় হাল্কা মনে হয়। তাছাড়া ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুলেই কিছু-না-কিছু মানুষের ভালবাসা পাওয়া যাবেই! এই পৃথিবীর মানুষ যত স্বার্থপর হোক, শুধু নিজেকে নিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না।

কাম অন সিস্টার, হ্যাভ ইট। কর্নেল সাহেব পেস্ট্রির একটা প্যাকেট এগিয়ে ধরতেই সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ হাসি মুখে একটা তুলে

নিলেন। ধন্যবাদও জানালেন।

ডক্টর, হ্যাভ ইট।

আমিও একটা পেস্ট্রি তুলে নিয়ে ধন্যবাদ দিলাম।

পেস্ট্রি খেতে-না-খেতেই কর্নেল-পত্নী মীনাদি ফ্লাস্ক থেকে চা দিলেন আমাকে ও সিস্টার ম্যাকলীন্স্‌কে। নিজেরাও নিলেন।

কর্নেল সাহেব চা খেতে খেতে বললেন, বোথ অফ ইউ উইল বী মাই গেস্ট টিল উই রিচ ক্যালকাটা।

কেন?

মাই ওয়াইফ ইজ গোয়িং টু গেট এ বয়-ফ্রেণ্ড ইন ক্যালকাটা।

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, অর দ্য আদার ওয়ে?

আনফরচুনেটলি নট ডক্টর। ভেবেছিলাম মেয়ের মেয়েই হবে কিন্তু হয়েছে ছেলে। অভিমান জানাতে গিয়েও খুশিতে ফেটে পড়লেন কর্নেল।

আমি আর সিস্টার ম্যাকলীন্স্‌ প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলাম, কনগ্রাচুলেশনস্‌!

সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার মেয়ে-জামাই কি কলকাতাতেই থাকেন?

হ্যাঁ, আমার জামাই কলকাতারই ছেলে। আবার অনুযোগ জানাতে গিয়েও গর্ব করে বলেন, এ ব্রাইট ইয়াং বয়, কিন্তু কিছুতেই কলকাতা ছাড়তে চায় না।

আমি হাসি। সিস্টার ম্যাকলীন্স্‌ বললেন, লাইক নর্থ ব্যাঙ্ক অফ প্যারিস কলকাতা নোংরা হলেও ভাল না বেসে উপায় নেই।

মীনাদি বললেন, আমার মেয়ে তো মাত্র বছর চারেক কলকাতায় আছে কিন্তু এরই মধ্যে সে কলকাতা ছেড়ে আসতে চায় না।

কর্নেল সাহেব একটু সংশোধন করে বলেন, দ্যাট মে বী বিকজ অফ মাই হ্যাণ্ডসাম সন-ইন-ল।

কর্নেলের কথায় আমি আর সিস্টার ম্যাকলীন্স্‌ হাসি।

মীনাদি ব্রিগেডিয়ারের মত কর্নেলকে শাসন করেন, মেয়ে জামাই

নিয়ে কেউ ঠাট্টা করে ?

গম্ভীর হয়ে কর্নেল জিজ্ঞাসা করলেন, করে না ?

না।

ঠিক আছে করব না।

পাঞ্জাব মেল ছুটে চলে। কখনও কখনও থামছে, আবার চলছে কিন্তু বাইরে তাকাবার অবকাশ পাই না। কথায়-বার্তায় গল্পগুজবের মধ্যে ডুবে থাকি। চারজনেই। তারপর দীর্ঘ পথের যাত্রী কর্নেল দম্পতি ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন। আমি আর সিস্টার ম্যাকলীন্স্ পাশাপাশি বসে গল্প করি।

সিস্টার ম্যাকলীন্স্-এর জন্ম এডিনবরা। স্কটল্যাণ্ড। শৈশব কেটেছে নানা দেশে। হংকং, জাকর্তা, অটোয়াতে। বাবা ফরেন সার্ভিসে ছিলেন। এ ছাড়া হংকং-জাকর্তা-অটোয়া থেকে ছুটিতে এডিনবরা যাবার সময় আরও অনেক দেশ দেখেছেন। সে-সময় ভারতবর্ষ দেখেন দু'বার। কচি মনের ক্যানভাসে তখনই কতক-গুলো সুন্দর রং-তুলির টান পড়ে যায়।

ম্যাকলীন্স্ সাহেবের কর্মজীবনের শেষ কটা বছর কাটে লণ্ডনে। সিস্টার ম্যাকলীন্স্ও তখন লণ্ডনে। তারপর আরও কটা বছর। লেখাপড়া শেষ করে সেলস্ গার্লের চাকরি নিলেন অক্সফোর্ড স্ট্রীটের একটা দোকানে। কত দেশের কত কাস্টমার আসে অক্সফোর্ড স্ট্রীটের দোকানে কিন্তু ইণ্ডিয়ান দেখলেই ভারতবর্ষের কথা মনে পড়ে যায়। ভারতবর্ষ আসা তো সহজ কথা নয়। অনেক টাকার দরকার। দুশো-তিনশো পাউণ্ড। বার্কলে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্টে কিছু কিছু জমলেও হঠাৎ খরচ হয়ে যায়। কিন্তু ইচ্ছা থাকলে উপায় হবেই। হল।

প্রথমে খরা, তারপরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল ভারতবর্ষের নানা জায়গায়। 'গার্ডিয়ান' আর 'টাইমস্' এর পাতায় সাহাযোর আবেদন ছাপা হল। সঙ্গে সঙ্গে দশ পাউণ্ডের একটা চেক পাঠিয়ে মিস ম্যাকলীন্স্ ফাদার রবিনসনকে লিখলেন, আমার মত সাধারণ মেয়েকে দিয়ে যদি কোন

কাজ হয়, জানাবেন। আর কিছু না হোক নিষ্ঠার অভাব আমার হবে না।

এক সপ্তাহের মধ্যে ফাদার রবিনসন চিঠির জবাব দিলেন। তার পরের শনিবার সকালেই প্রথম রিলিফ টিমের সঙ্গেই চার্টার্ড প্লেনে হিথরো ত্যাগ করলেন।

সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌ একটু হাসলেন। বললেন, এলাম কিন্তু আর ফিরে গেলাম না।

আমি শুনে স্তম্ভিত। আমার মত ঘরকুনো মানুষের কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য ও কল্পনাতীত। শুধু আমার কাছে কেন? ক'জন মানুষ নিজের দেশ-বাড়ি সমাজ-সংসার ত্যাগ করে পৃথিবীর আরেক দিগন্তের মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেন? যে যা-ই বলুক আমাদের দেশে রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু সন্ন্যাসী ছাড়া আর কারুর দ্বারা এমন পাগলামি সম্ভব নয়, কিন্তু সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌ এমন সহজ সরল ভাবে বললেন যেন এক স্কুল থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হয়েছেন।

ওঁর কথা শোনার পর কয়েক মিনিট চুপ করে বসে রইলাম। কোন কথা বলতে পারলাম না, কোন প্রশ্ন মনে এল না। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, মনে হয় আপনি কোন হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত আছেন?

হ্যাঁ। আমি বছর ছয়েক পুরুলিয়া লেপ্রসী হোমে আছি।

পুরুলিয়া? হঠাৎ অবিশ্বাস্যের মত জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ, পুরুলিয়া। এবার সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌ আমাকে একটা ছোট্ট সাধারণ প্রশ্ন করলেন, পুরুলিয়া গিয়েছেন?

আমি বাঙালী। কলকাতাবাসী। পুরুলিয়া পশ্চিম বাঙলারই একটা জেলা। বোধ হয় একশো-দেড়শো-দুশো মাইল দূরে হবে। তার বেশি কিছুতেই নয়। কোন-না-কোন কারণে পুরুলিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। প্রয়োজন না থাকলেও যাওয়া যায়। উচিত। হাজার হোক, পশ্চিম বাংলারই তো একটা জেলা। চায়ের আড্ডায়, কফি-

হাউসের মজলিশে, তর্ক-বিতর্কের সময় বাঙালী-প্রীতি, পশ্চিম বাঙলার প্রতি দরদ দেখাই, কিন্তু পুরুলিয়া ?

না দেখিনি। কেন দেখব ? পুরুলিয়া তো দার্জিলিং বা দীঘা নয় যে সেখানে গেলে প্রিয় বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হবে অথবা কলকাতা ফিরে এলে আমার মর্যাদা বাড়বে। আর বাঙালী প্রেম দেখাবার জন্য কি সারা বাংলাদেশ ঘুরতে হবে ? খবরের কাগজ আর বিশ্বজিৎ তো আছে।

সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্-এর কাছে চাবুকের বাড়ি খেয়ে আমি প্রায় বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর ক্রমে ক্রমে সাহস সঞ্চয় করে বললাম, না সিস্টার, আমি পুরুলিয়া যাই নি।

ঐখানেই থামলাম। সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌কে আর কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস আমার হল না। কথায় কথা বাড়বে। উনি দশটি কথা বললে আমাকে দুটি-একটি কথা বলতে হবে, কিন্তু কি বলব ? যদি পুরুলিয়া নিয়েই আবার কথা ওঠে ? নিজের দেশ, জাতি সম্পর্কে আমার জ্ঞান-ভাণ্ডারের স্বর্ণতোরণ খুলে দেবার দরকার নেই। চুপ করে রইলাম।

আমার সঙ্গে পুরুলিয়ার একটা ছেলে আশুতোষ কলেজেই বি. এস-সি পড়ত। তাকে দেখলেই কেষ্ট ঘোষ বলত, কুষ্ঠ আর ফাইলেরিয়া, এই নিয়ে পুরুলিয়া।

পুরুলিয়ার পবিত্র মাহাতো সঙ্গে সঙ্গে একটা কবিতা আবৃত্তি করে জিজ্ঞাসা করত, জানিস কে লিখেছেন ?

কেষ্ট ঘোষ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিত, এটা আবার কোন কবিতা নাকি ?

তা তো বটেই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি কবিতা লিখতে জানতেন ?

পুরুলিয়া সম্পর্কে এইটুকুই আমার জ্ঞান। এর বেশি জানি না, শিক্ষিত বাঙালী বলে নিজেকে পরিচয় দেবার জন্য এর বেশি জানার প্রয়োজন হয়নি।

কিছুক্ষণ চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। যতটা উৎসাহ নিয়ে সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্-এর সঙ্গে আলাপ করেছিলাম, সে উৎসাহ আর নেই। নিজেকে আরো ছোট, অপমানিত করতে ইচ্ছা করল না।

ডক্টর, একবার পুরুলিয়া আসুন, অ্যাণ্ড ইউ উইল বী মাই গেস্ট।

হাসলাম। বললাম, বলুন কবে আসব?

যেদিন খুশি।

তবুও কবে গেলে আপনার সুবিধা হবে?

শনিবার-রবিবার এলে একটু বেশি ফ্রী থাকব। সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, একটু আগে খবর পেলে আমিই স্টেশনে থাকব। আপনার কোন অসুবিধে হবে না—তাহলে কবে আসছেন?

হঠাৎ বলে ফেললাম, যদি সামনের শনিবারেই আসি?

খুব ভাল কথা। আমি শনিবার সকালে চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার অ্যাটেণ্ড করব।

ঠিক আছে।

বন্ধুবান্ধবরা চিরকাল অভিযোগ করে এসেছে, আমি নাকি ছোট-খাটো সাধারণ ব্যাপারেও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। ঠিক। কোন তাগিদ বোধ করিনি, কিন্তু যেদিন সত্যিসত্যিই একটা সিদ্ধান্ত নিলাম, সে খবর কেউ জানতে পারল না।

সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌কে কথা দেবার পরেই মনের মধ্যে কেমন যেন একটা চাপা আনন্দ, উত্তেজনা অনুভব করলাম। মনে হল বোধ হয় সমুদ্রযাত্রার জন্য আমি জীবন-নদীর মোহনায় পৌঁছে গেছি।

॥ দুই ॥

মা শুনে অবাক হলেন কিন্তু আপত্তি করলেন না।

মীনু বলল, কি ব্যাপার বল্ তো দাদা, তুই হঠাৎ পুরুলিয়া যাচ্ছিস?

কোন ব্যাপার না থাকলে কি কোথাও যেতে নেই?

তবুও কিছু একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। তা না হলে তোর মত লোক হঠাৎ পুরুলিয়া যাবে কেন?

এক বন্ধুর কাছে বেড়াতে যাচ্ছি।

মীনু তবু বিশ্বাস করতে চায় না, পুরুলিয়ায় আবার তোর বন্ধু কোথায়?

আমি ওকে একটু বকুনি দিলাম, যা, ভাগ্ তো। থানার দারোগার মত জেরা করতে শুরু করেছে।

মীনু চলে গেল ঠিকই কিন্তু ওর মনের মধ্যে প্রশ্নটা রয়ে গেল। আমি তার জবাব দিতে পারলাম না। সম্ভব ছিল না। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখে ময়ূরের আনন্দ হলেও সবার হতে পারে না। আমি কেন পুরুলিয়া যাচ্ছি তা মীনুকে বোঝাব কি ভাবে? বলতে পারলাম না, সিস্টার ম্যাকলীন্স্-এর অনুরোধ, আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারিনি বলেই পুরুলিয়া যাচ্ছি।

হাওড়া স্টেশনের তেরো নম্বর প্ল্যাটফর্মে হাজির হয়েই বুঝলাম পুরুলিয়া সত্যিই দুয়োরাণী, সুয়োরাণী নয়। কয়লার মত কালো কালো মানুষের ভিড়ে প্ল্যাটফর্ম ভর্তি। প্ল্যাটফর্মে আলো না থাকলে মনে হত কঙ্কালের শোভাযাত্রা দেখছি। ক'দিন আগেই পাঞ্জাব মেলে লখনৌ গেলাম, এলাম। বহু সাধারণ গরীব যাত্রীকেও দেখলাম। আমাদের মেডিক্যাল কলেজের আউটডোরে কত নিঃসম্বল ভিখারীকেও দেখি। দারিদ্র্যের চিহ্ন ওদের সর্বাঙ্গে লেগে আছে কিন্তু তেরো নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাদের দেখলাম, তারা শুধু দরিদ্র নয়, উপেক্ষিতও। দারিদ্র্যের চাইতেও উপেক্ষা ও অবজ্ঞা মানুষের বড় শত্রু।

মানুষগুলোর মত আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারের প্রতিও রেল কোম্পানীর বিচিত্র ঔদাসীন্য। প্ল্যাটফর্মে রিজার্ভেশন চার্ট লাগাবার জায়গায় এ ট্রেনের রিজার্ভেশন চার্ট থাকে না। প্রয়োজন বোধ করে না রেল কোম্পানী। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এল। অন্ধকার। বাইরে লটকানো রিজার্ভেশন চার্ট দেখে গাড়িতে উঠলাম। টি-টি এল না, কণ্ডাক্টর গার্ডও দেখলাম না। বুঝলাম, এ ট্রেনে বিনা টিকিটের যাত্রী দুর্লভ বলেই তাদের উৎসাহ নেই।

রিজার্ভেশন চার্টে দুজনের নাম থাকলেও ভিতরে গিয়ে দেখি আমার আগেই তিনজন এসে গিয়েছেন। ট্রেন ছাড়তে-না-ছাড়তেই ওরা জামা-প্যান্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরলেন, শোবার উদ্যোগ-আয়োজনও শুরু করলেন।

ট্রেন ছাড়ার পর ওদেরই একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, এই ট্রেনটা পুরুলিয়া পৌঁছবে কখন বলতে পারেন?

রাইট টাইম বোধ হয় ছ'টা কুড়ি ; তবে মোটামুটি ঘণ্টাখানেক লেট থাকেই। ভদ্রলোক ক্যাভেণ্ডার সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, আটটার মধ্যে নিশ্চয়ই পৌঁছবেন।

মুখে ধন্যবাদ জানালেও মনে মনে হাসলাম। রেল কোম্পানির এটুকু ঔদাসীন্য যেন এ লাইনের যাত্রীদের জন্মগতসূত্রে প্রাপ্ত।

বিদ্যুৎ চমকাবার মত মাঝে মাঝে খুব জোরে আলো জ্বলে উঠেই আবার অন্ধকারে ভরে যাচ্ছে সারা গাড়ি। ওঁরা শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ চুপ করে জানালার ধারে বসে থাকার পর আমিও শুয়ে পড়লাম। জানতে পারলাম সাঁত্রাগাছি, রামরাজাতলা চলে গেল— কিন্তু তারপর আর নয়। ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল আদ্রা স্টেশনে। ওঁরা তিনজন নেই। আমি একা। চা খেলাম। প্ল্যাটফর্মে নেমে একটু পায়চারি করলাম কিন্তু ট্রেন ছাড়ার কোন উৎসাহ দেখলাম না। আবার কম্পার্টমেণ্টে ফিরে এলাম। চলন্ত ট্রেনে সারাদিন বসে থাকা যায় কিন্তু ট্রেন যখন চলে না তখন চুপ করে বসে থাকতে অসহ্য লাগে। আবার প্ল্যাটফর্মে নামলাম। আবার

পায়চারি করলাম কিন্তু আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারের যাত্রীদের মধ্যে কোন বিরক্তির ভাব দেখতে পেলাম না। যুগ যুগ ধরে যারা উপেক্ষিত, অবহেলিত, তারা অত সহজে বিরক্ত হবে কেন?

আদ্রা থেকে পুরুলিয়া পৌঁছবার মধ্যেই বাথরুমে গিয়ে সব কিছু সেরে নিলাম। কম্পার্টমেন্টে আর কোন যাত্রী ছিলেন না বলে বার বার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আরও একটু সুন্দর দেখাবার চেষ্টা করলাম। তখনও রুমাল দিয়ে মুখ পরিষ্কার করছি, হঠাৎ কিছু লোকজনের কলরব কানে আসতেই জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া! সত্যি তাহলে এলাম!

সুটকেসটা হাতে করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে একবার দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে আনতেই অনেকগুলো কালো মানুষের মধ্যে সিস্টার ম্যাকলীন্স্‌কে দেখতে কষ্ট হল না। উনি হাসতে হাসতে হাত নাড়লেন। আমিও।

প্ল্যাটফর্মে নেমে কয়েক পা এগোতেই উনি সামনে এসে হাজির। হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডসেক করতে করতেই বললেন, তাহলে সত্যিসত্যিই পুরুলিয়া এলেন?

আপনার ইনভিটেশনেও আসব না?

সিস্টার ম্যাকলীন্স্‌ একবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আমিও হাসলাম। স্টেশনের বাইরেই সাইকেল-রিক্শার ভিড়। সব রিক্শাওয়ালাই চিৎকার করে প্যাসেঞ্জার ডাকছে। সিস্টার ম্যাকলীন্স্‌ নিঃশব্দে একটা রিক্শার কাছে গিয়ে আমাকে বললেন, বসুন।

আগে আপনি।

আমার বাই-সাইকেল আছে।

আমি রিক্শায় উঠে বসতেই পাশ থেকে একটা লেডিজ বাই-সাইকেলে উঠলেন সিস্টার ম্যাকলীন্স্‌। রিক্শার পাশেই ওঁর সাইকেল। বললাম, শনিবারের সকালটা আমি নষ্ট করলাম তো?

কেন ?

সকালে উঠেই স্টেশনে এসে এতক্ষণ অপেক্ষা করা কি কম কষ্টের ?

আমি তো স্টেশনে বেশীক্ষণ আসিনি।

জানতেন বুঝি ট্রেন লেট আছে ?

এ-ট্রেন রোজই লেট করে আসে।

বুঝলাম এ ট্রেন লেট হবার জন্য ওঁরও কোন বিরক্তি নেই।

এ-রাস্তা সে-রাস্তা, কোর্ট-কাছারি, দোকান-বাজার, বাস স্ট্যাণ্ড পার হয়ে আর কয়েকটা গলি ঘুরে মনে হল শহরের অন্য প্রান্তে এসে গেছি। সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ ডান হাত দিয়ে দূরের একটা চার্চ দেখিয়ে বললেন, ডক্টর, ঐ হচ্ছে আমাদের লেপ্রসী হোম।

দূর থেকে দেখেই বুঝলাম অনেক অবজ্ঞা রুক্ষতার মাঝখানে একটা আশার আলো। বললাম, আপনি কি ঐখানেই থাকেন ?

না, না, এই তো সামনেই আমার কোয়ার্টার।

একটু পরেই ডানদিকের গেটে সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ ঢুকলেন। পিছন পিছন সাইকেল-রিক্শাও ঢুকল। রিক্শাওয়ালা আমার স্যুটকেসটা সামনের বারান্দায় রেখে দিতেই আমি পার্স থেকে হুটো টাকা বের করে ওকে এগিয়ে দিলাম। ও নিল না। সিস্টার ম্যাক-লীন্‌স্ বললেন, ও নেবে না।

কেন ?

ও জানে আপনি আমার গেস্ট।

মনে হল রিক্শার ভাড়া আগেই দেওয়া হয়েছে।

সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ বললেন, আসুন, আসুন, লেট আস হ্যাভ টি।

লম্বা বারান্দার সঙ্গে তিনখানি ঘর। হু' কোণায় হুটি শোবার ঘর, মাঝখানে ড্রইংরুম। কার্পেট নেই, সোফা নেই, শুধু কয়েকটা বেতের চেয়ার আর টেবিল, কিন্তু সব কিছু চক্‌চক্ করছে। একদিকের দেয়ালে ভগবান যীশুব একটা ছবি, অন্যদিকে একটা ক্যালেণ্ডার।

আমার স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে ডানদিকের ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে উনি বললেন, আসুন।

ওঁর পিছন পিছন ওঘরে যেতেই বললেন, দিস ইজ ইওর রুম। ঘরের কোণায় একটা দরজার দিকে ইশারা করে বললেন. ছাট ইজ টয়লেট। আপনি একটু হাত-মুখ ধুয়ে আসুন, আমি চা নিয়ে ড্রইং-রুমে আসছি।

ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? একটু রেস্ট নিয়ে নিন না?

বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় বড় করে সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ বললেন, এই সকালবেলাতেই রেস্ট নেব কেন? আপনি আসুন, আমি চা করছি।

উনি ঘর থেকে চলে যেতেই চারদিকে তাকিয়ে দেখি অতিথির জন্য বিধিব্যবস্থার কোন ত্রুটি নেই। বাথরুমেও তেল, সাবান, তোয়ালে। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে তোয়ালেতে ভাল করে মুখ পরিষ্কার করে ড্রইংরুমে ঢুকতেই সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ চায়ের ট্রে নিয়ে এলেন।

বললাম, আপনার ইনভিটেশনে এখানে আসা আমার উচিত হয়নি।

টেবিলের উপর চায়ের ট্রে নামিয়ে রেখে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

আপনাকে এত বিরক্ত করব জানলে হয়তো আসতাম না।

আমার সামনে চেয়ারে বসতে বসতে সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ বললেন, না ডক্টর, সত্যি বিরক্ত হচ্ছি না।

বিরক্ত না হলেও কষ্ট তো হচ্ছে?

মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, না, কষ্টও হচ্ছে না; বরং ভালই লাগছে।

উনি চা তৈরি করতে শুরু করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

এমনিতে বেশ ভালই আছি, তবে বন্ধুবান্ধব না পেয়ে মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি।

আমি চুপ করে রইলাম। উনি আমার দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি এসেছেন বলে দু-চারটে দিন বেশ ভালই কাটবে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতেই বিস্কুটের প্লেট এগিয়ে দিলেন। প্রতিবাদ না করে গোটা দুই বিস্কুট তুলে নিলাম। ঐ চা-বিস্কুট খেতে খেতেই কথা হয়।

ইণ্ডিয়ায় আসার পর দেশে গিয়েছেন?

বাবা মারা যাবার পর একবার মাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

আর যাননি?

না। সিস্টার ম্যাকলীন্স্ হাসতে হাসতে বললেন, আমি কি বড়লোক যে বছর বছর লণ্ডন ঘুরে আসব?

প্রত্যেক বছর ছুটি তো পান?

তা পাই।

ছুটিতে কোথাও বেড়াতে যান না?

জেনারেলি কোন হিল স্টেশনে চলে যাই।

আজকে কি আপনার অফ ডিউটি?

হ্যাঁ, আজ আর কাল দুদিনই আমার অফ। সিস্টার ম্যাকলীন্স্ হাসতে হাসতে বললেন, দুদিন খুব আড্ডা দেব। আপনাদের বাঙলাদেশে থাকতে থাকতে আমিও বেশ আড্ডা দিতে শিখে গেছি।

ওঁর কথায় আমি হাসি। সিস্টার ম্যাকলীন্স্ তখনও হাসছেন। বললেন, লাস্ট ইয়ার আমার এক বন্ধু আর তার হাসব্যাণ্ড লণ্ডন থেকে বাই কার ইণ্ডিয়া এসে আমার এখানে তিনদিন ছিল। ওরা আমার ভাত আর মাছের ঝোল খাওয়া দেখে কি বলেছিল জানেন?

কি?

বলেছিল আমার ব্রিটিশ ন্যাশানালিটি অটোমেটিক্যালি ক্যানসেলড হয়ে গেছে।

আবার হাসি। উনি আমার কাপে আবার চা ঢেলে দিলেন। নিজেও নিলেন।

দেখছেন তো কেমন চা খাচ্ছি ? আর আগে ? ওনলি থ্রী কাপস এ ডে।

ভারী মজা লাগে সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌-এর কথায়।—পারি না ছটো জিনিস।

কি কি ?

নাম্বার ওয়ান শাড়ি পরতে পারি না। খুলে যায়।...

ক'দিন অভ্যাস করলেই ঠিক পরতে পারবেন।

ছটো-তিনটে শাড়ি আমার আছে কিন্তু সেগুলোর কোন ব্যবহারই হয় না।

একেবারেই পরেন না ?

ইয়ার-বিফোর লাস্ট ছর্গাপূজার সময় শাড়ি পরে বেরিয়েছিলাম কিন্তু সাইকেল-রিক্‌শা থেকে নামার সময় অনেক ছেলেমেয়ের সামনে শাড়িটা খুলে গেল। সিন্স দেন আর শাড়ি পরি না।

শাড়ির প্রসঙ্গ শেষ করার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, শাড়ি পরা ছাড়া আর কি পারেন না ?

বাংলা পড়তে পারি না।

একেবারেই পড়তে পারেন না ?

নিউজ পেপারের খুব বড় বড় হেডিং একটু একটু পড়তে পারি, কিন্তু তাও ঠিক কারেক্ট হয় না।

কিছুদিন কেউ একটু গাইড করলেই শিখে যাবেন।

সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌ হাসতে হাসতে বললেন, একজন টিচার উইকে ছদিন এসে আমাকে পড়াচ্ছিলেন, কিন্তু তিন-চারদিন এসেই আর এলেন না।

কেন ?

ডক্টর, এখনই আই অ্যাম জাস্ট টোয়েন্টিনাইন। এক কথায় ইয়াং গার্ল। তারপর ফরেনার। সো হি হ্যাড টু গিভ ইট আপ। উনি একবার আমার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, আমার মত মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা আপনাদের সোসাইটি টলারেট করবে কেন ?

শুনে লজ্জা লাগল, কিন্তু চুপ করে থাকলাম না। বললাম, আমিই মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে এসে আপনাকে বাংলা পড়িয়ে যাব।

আমার প্রস্তাব শুনে উনি হো হো করে হেসে উঠলেন। আমিও হাসি।

চা খাওয়া শেষ হল, হাসিও থামল। সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ ডাকলেন, দিদি!

আমি একটু অবাক হয়ে দরজার দিকে তাকাতেই একজন ভদ্র-মহিলা ঘরে ঢুকেই হাত জোড় করে আমাকে নমস্কার করলেন। আমিও ওঁকে নমস্কার করলাম।

দিদি, ইনিই সেই পাঞ্জাব মেলের ডাক্তার সাহেব।

দিদি মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন, বুঝেছি।

বল, ডাক্তার সাহেবকে আজ কি খাওয়াবে?

এবার আমি কথা বলি, আমার খাওয়া-দাওয়ার জন্য আপনাদের অত মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

দিদি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কত কষ্ট করে আমাদের এখানে এসেছেন আর আমরা কি আপনাকে ডাল-ভাত খাইয়ে রাখব?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এইটুকু আসতে আবার কষ্ট কিসের? ডাল-ভাত খেয়েই আমি মহানন্দে থাকব।

সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ বললেন, এ বাড়িতে এলেই 'দদির কথামত চলতে হবে।

আমি দিদিকে বললাম, দিদি, আমি কি বলেছি আপনার কথা শুনব না?

দিদি মাথার ঘোমটা একটু টানতে টানতে বললেন, দুপুরে মাছ, রাত্রে মুরগী করব ভেবেছি।

সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ দিদির একটা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, ভেরী গুড!

দিদি আমাকে নমস্কার করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি দিদির যাবার পথের দিক থেকে দৃষ্টিটা গুটিয়ে এনে সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম, দিদি বুঝি অনেকদিন আপনার এখানে কাজ করছেন ?

অলমোস্ট চার বছর।

দিদির বাড়িও কি পুরুলিয়ায় ?

না, আপনাদের কলকাতায়।

ওঁর হাসব্যাণ্ড বুঝি এখানেই ··

আমাকে কথাটা শেষ করতে হল না। সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌ মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, হি ইজ ডেড !

পুরুলিয়ায় ওঁর কেউ আছেন নাকি ?

সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌ একটু করুণ হাসি হেসে বললেন, কেউ নেই বলেই তো এখানে আছেন।

ওঁর কথা শুনেই আমি বুঝলাম, দিদির জীবনে কোন রহস্য, কোন দুঃখের ইতিহাস চাপা পড়ে আছে, কিন্তু সদ্য-পরিচিতা একজন মহিলার জীবনকাহিনী জানার জন্য অহেতুক আগ্রহ প্রকাশ করতে ইচ্ছা করল না।

সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ডক্টর, আমরা যারা লেপ্রসী পেসেন্ট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি তাদের কাছে সাধারণ স্বাভাবিক মানুষরা আসে না। ভয় পায়। যাঁরা আসেন, তাঁরা না এসে পারেন না।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে সামনের বারান্দায় দুটো বেতের চেয়ারে মুখোমুখি বসে নানা কথা বলতে বলতে সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌ দিদির কথা শুরু করলেন।

·

বেশ ক'বছর আগেকার কথা। বাঁকুড়ার গৌরীপুর লেপ্রসী কলোনীতে মহা ধুমধাম করে দুর্গাপুজা হচ্ছে। দীর্ঘ দিন, বছরের পর বছর এই কলোনীতে থেকে যারা রোগমুক্ত হয়ে চলে গিয়েছেন,

তাঁরাও দলে দলে এসেছেন। প্রত্যেক বছরই এঁরা আসেন। না এসে পারেন না। সংসারের সমস্ত আত্মীয়স্বজনের চাইতে এই হাসপাতালের পুরনো ও বর্তমান রোগীরা এঁদের অনেক কাছের মানুষ। পূজার সময় সবাই তো প্রাণের মানুষ, কাছের মানুষের কাছেই আসে। সেদিন অষ্টমী। মহাষ্টমী। পূজা শেষ হলেও তখনও চণ্ডীপাঠ চলছে। গৌরীপুর কলোনীর অতীত ও বর্তমানের হাজার-খানেক রোগী প্যাণ্ডেলে উপস্থিত। কেউ পূজার কাজ করছেন, কেউ চণ্ডীপাঠ শুনছেন। অনেকে আবার ভোগ রান্নায় ব্যস্ত।

বেলা আড়াইটে-তিনটে হবে। তখনও চণ্ডীপাঠ চলছে। ডাঃ ঘোষ এবার খাওয়াদাওয়া করার জন্য প্যাণ্ডেল থেকে কোয়ার্টারে যাচ্ছেন।

ডাক্তারবাবু —!

হঠাৎ গাছের পাশ থেকে একটা মেয়ের ডাক শুনে ডাঃ ঘোষ থমকে দাঁড়ালেন।

গাছের ওপাশ থেকে ঘুরে এসে মেয়েটি ডাঃ ঘোষের সামনে এসেই কেঁদে ফেলল।

কি হল? কাঁদছ কেন?

একবার নয়, বেশ কয়েকবার অনুরোধ-উপরোধ করে প্রশ্ন করার পর মেয়েটি বলল, ডাক্তারবাবু, আমার স্বামীর কুষ্ঠ হয়েছে।

কে বলল তোমার স্বামীর কুষ্ঠ হয়েছে?

কলকাতার এক ডাক্তার।

তার জন্য কাঁদছ কেন? পূজার পর নিয়ে এস, দেখব।

পূজার পর না ডাক্তারবাবু, আজই ওকে একটু দেখুন।

আজ তো আমাদের এখানে সব কিছু বন্ধ···

না ডাক্তারবাবু, আপনি এখনই ওকে একটু দেখুন।

ডাঃ ঘোষ আশেপাশে দেখতে গিয়ে দূরের এক গাছতলায় একটা লোককে চোরের মত লুকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ কি তোমার স্বামী?

হ্যাঁ ডাক্তারবাবু।

এদিকে ডাক দাও তো।

স্ত্রী ইশারা করে ডাকতেই স্বামী বলির পাঁঠার মত প্রায় কাঁপতে কাঁপতে এসে ডাঃ ঘোষের সামনে দাঁড়াল।

ডাঃ ঘোষ একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়েই বললেন, জামাটা ওঠাও।

মেয়েটিই সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর শার্ট আর গেঞ্জি তুলে ধরল। ডাঃ ঘোষ বুক-পিঠ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কাপড়ের তলায় কোথাও কিছু আছে নাকি?

মেয়েটি বলল, না ডাক্তারবাবু, আর কোথাও কিছু নেই।

ডা. ঘোষ মেয়েটিকেই জিজ্ঞাসা করলেন, কোন ওষুধ খাওয়াচ্ছ?

কিছুদিন চালমুগরার তেল···

ডাঃ ঘোষ ওর পুরো কথা না শুনেই জিজ্ঞাসা করলেন, ও ছাড়া আর কিছু?

না ডাক্তারবাবু।

ডাঃ ঘোষ একবার হাতের ঘড়িটা দেখলেন। একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, কলকাতার ডাক্তারবাবু ঠিকই বলেছেন তবে ভয়ের কিছু নেই।

আপনাদের এখানে থাকলে সেরে যাবে বলেই তো নিয়ে এসেছি।

আমাদের এখানে রাখার দরকার নেই····

না ডাক্তারবাবু, আপনাদের এখানেই রাখতে হবে, নয়তো ··

তোমার স্বামীর কুষ্ঠ হয়েছে ঠিকই কিন্তু ছোঁয়াচে ধরনের না। বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করালেই ভাল হয়ে যাবে।

না ডাক্তারবাবু, বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করা যাবে না। আপনি দয়া করে···

লক্ষ্মী মা! আমার কথাটা শোন।····

বহুকাল ধরে বহু কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসা করতে করতে এই হত-ভাগ্য মানুষগুলোকে ডাঃ ঘোষ বড় ভালবাসেন। জানেন, ওদের

চিকিৎসার চাইতেও ভালবাসা, সমবেদনার দরকার অনেক বেশী ওরা, ওদের প্রিয়জনেরা যতই যুক্তি-তর্ক করুক না কেন, ডাঃ ঘোষ জানেন ওদের মনের মধ্যে কত দুশ্চিন্তা আর বিভীষিকা জমে থাকে। ওরা আবোল-তাবোল যা-তা বলবেই।

আরতির কথায় ডাঃ ঘোষ একটুও রাগ করলেন না। আস্তে আস্তে ওকে, ওর স্বামী অলোককে বোঝালেন, কুষ্ঠ রোগ খারাপ হলেও বারো আনা রোগীর কুষ্ঠ ছোঁয়াচে ধরনের হয় না। বাড়িতে একটু সাবধানে রেখে চিকিৎসা করালেই ভাল হয়ে যায়।···বিশ্বাস কর আরতি, অলোককে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করালেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। আমি কথা দিচ্ছি···

আরতি ডাঃ ঘোষের কথা মেনে নিতে পারে না।··না ডাক্তারবাবু, ওকে বাড়িতে নিয়ে গেলে আমাদের দুজনকেই আত্মহত্যা···

আঃ! কি যা-তা বলছ! আমাদের এখানে ছোঁয়াচে রুগী রেখেই কূল পাই না আর তোমার স্বামীর মত রুগী রাখতে হলে তো আমরা পাগল হয়ে যাব···

কিন্তু···

এখন যাও। পূজার পর ওকে আমার কাছে নিয়ে এস।

অনেক বেলা হয়ে গেছে। ক্ষিদেও লেগেছে। ডাঃ ঘোষ আর দেরি না করে কোয়ার্টারের দিকে এগুতে শুরু করেন। আরতি ছুটে এসে ওঁর দুটো পা জড়িয়ে ধরল, ডাক্তারবাবু, আজ মহাষ্টমীর দিনে আমাদের এমন করে ফিরিয়ে দেবেন না ডাক্তারবাবু।

ডাঃ ঘোষ আর ওর চোখের জল সহ্য করতে পারলেন না। চিৎকার করে ওয়ার্ড-বয়কে ডাকলেন, ষষ্ঠী!

ষষ্ঠী ছুটে এল।

একে একটা বেড দিয়ে দে। আমি পরে এসে দেখছি।

সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ খুব জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,

হাসপাতালে ভর্তি হবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দিদির হাসব্যাণ্ড সুইসাইড করলেন।

চমকে উঠলাম, কেন?

দিদি আর ডাক্তারবাবু চলে যাবার পরই পুজা-প্যাণ্ডেলের কাছাকাছি অলোকবাবুর সঙ্গে ওদের পাড়ার এক ভদ্রলোকের দেখা....

ঐ ভদ্রলোকও কি ওখানকার পেসেন্ট ছিলেন?

না, উনি ঐ হাসপাতালের একজন সাপ্লায়ার ছিলেন। ওঁর সঙ্গে দেখা হবার পরই উনি হাসপাতালের পাশের রেল লাইন দিয়ে মালগাড়ি যাবার সময়...

মাই গড! একটু জোরেই চিৎকার করে উঠলাম। কিন্তু উনি ওঁর সঙ্গে দেখা হবার পরই এ কাজ করলেন কেন?

সিস্টার ম্যাকলীন্স্ একটু হাসলেন। খুব আস্তে আস্তে চাপা গলায় বললেন, ডক্টর, অলোকবাবুর লেপ্রসী হবার খবর পাড়ায়, বন্ধু-বান্ধব, রিলেশানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে ওরা কি টিঁকতে পারত? ভাল হয়ে যাবার পরও ওদের কোথাও জায়গা হত না।

পাঁচ বছর মেডিক্যাল কলেজে পড়ে আমি ডাক্তার হয়েছি। হ্যানসেন সাহেবের আবিষ্কৃত জীবাণু যে একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষকে তিলে তিলে শেষ করে দিতে পারে, তা আমি জানি। জানি আরো অনেক কিছু।

মিশরের মমী, ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানের চাইতেও কুষ্ঠরোগ অনেক প্রাচীন। মানুষের অন্যতম আদিমতম রোগ। কেউ জানেন না, কবে, কোথায়, কেমন করে কুষ্ঠরোগ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। শোনা যায় আফ্রিকাই এর সূতিকা-ঘর। তারপর আস্তে আস্তে ভারতবর্ষ। তারপর চীন। তারপর আরো কত দেশে। ভারতবর্ষ থেকে পূর্ব গোলার্ধে, মিশর থেকে পশ্চিমে।

যীশুর জন্মের ছ'শো বছর আগে লেখা আমাদের শুশ্রুতসংহিতায় 'অরুণ-কুষ্ঠ'র উল্লেখ আছে। মনুসংহিতাতেও আছে। মনু কুষ্ঠ-

রোগীর সঙ্গে বিয়ে নিষিদ্ধ করেছেন ঠিকই কিন্তু যে কন্যাদাতা কন্যার কুষ্ঠ হয়েছে জানিয়ে বিয়ে দেন, তাকে কোন শাস্তি দেওয়া হবে না বলেও জানিয়েছেন।

অনেক গবেষকের মতে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্বরের কুষ্ঠরোগ হয়। তারপর সূর্যের উপাসনায় রোগমুক্ত হলে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কোনার্কে সূর্যমন্দির তৈরি করেন।

নানা প্রাচীন মিশরীয় কাহিনীতে বুঝি লেখা আছে যীশুর জন্মের প্রায় তেরশো-চোদ্দশো বছর আগে দ্বিতীয় র‍্যামেসিসের রাজত্বকালে নিগ্রো ক্রীতদাসরা সুদান থেকে এ রোগ নিয়ে আসে। এর চাইতেও পুরনো কাহিনী হল এবার্স প্যাপিরাসের মত প্রাচীন চিকিৎসা-বিদ্যার বইতে কুষ্ঠরোগের কথা আছে।

যে কোন প্রাচীন বিষয়বস্তুর ব্যাপারেই নানা ধরনের কথা-কাহিনী প্রচলিত হয়। কুষ্ঠরোগ নিয়ে এ ধরনের অজস্র কাহিনী আছে। বিশ-পঁচিশ বছর আগে পর্যন্ত হিডনোকার্পাস অয়েলের ইনজেকশন দিয়েই কুষ্ঠের চিকিৎসা হত। কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলের ডাঃ লিওনার্ড রজার্স চালমুগরার তেলের এই ইনজেকশান আবিষ্কারের আগে চালমুগরার তেলই ছিল একমাত্র ওষুধ। শোনা যায় শ্যাম-দেশের রাজপুত্রের কুষ্ঠ হলে তিনি মনের দুঃখে বনে চলে যান। বনের গাছপালা ফলমূল খেয়ে থাকতে থাকতে রাজপুত্রের কুষ্ঠ সেরে যায়। আবিষ্কার হল চালমুগরার তেল।

ওল্ড টেস্টামেণ্টের 'জারাথ' আর নিউ টেস্টামেণ্টের 'লেপ্রা' নিশ্চয়ই কুষ্ঠ বা কুষ্ঠ-জাতীয় রোগকে বুঝিয়েছে। এসব ছাড়াও মিশরের নানা মমীর ক্ষয় হয়ে যাওয়া হাত-পা ও অ্যাবিসিনিয়ার পুতুলের মত মানুষের কঙ্কাল থেকে বোঝা যায়, আদিমতম কাল থেকে কুষ্ঠ আমাদের সঙ্গী।

যাই হোক যুদ্ধবিগ্রহের দৌলতেই কুষ্ঠরোগ ছড়িয়ে পড়ল দেশ-দেশান্তরে। যীশুর জন্মের সাড়ে তিনশো বছর আগে গ্রীসে কুষ্ঠরোগ দেখা দিল। এরপর পম্পেয়ীর সৈন্যবাহিনী পূর্বদেশ থেকে ফিরলে ইটালীতে এবং রোমান সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বহু

দেশে ছড়িয়ে পড়ল। সাত-আটশো বছর আগে কুষ্ঠরোগ ইউরোপে প্রায় মহামারীর রূপ নিলেও তিন-চারশো বছরের মধ্যেই এ রোগকে ইউরোপ ত্যাগ করতে হল। এ সর্বনাশা রোগ বিশ্বভ্রমণের নেশায় *আমেরিকাতেও গিয়েছিল কিন্তু টিঁকতে পারেনি। পৃথিবীর নানা* দিক থেকে বিতাড়িত হয়ে দারিদ্র্য আর কুসংস্কারের তীর্থভূমি ভারতবর্ষের মত এশিয়া-আফ্রিকার কিছু দেশে কুষ্ঠরোগ বেশ জমিয়ে রাজত্ব করছে। পৃথিবীর ষাট-পঁয়ষট্টি লক্ষ কুষ্ঠরোগীর মধ্যে অন্তত পঁচিশ লক্ষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-বিধৌত গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের মানুষ। কুষ্ঠরোগ ছাড়া পৃথিবীর আর কোন সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের মালিক, অংশীদার আমরা নই।

মেডিক্যাল কলেজে পাঁচটি বছর কাটাতে গিয়ে এসব জেনেছি। জেনেছি এ রোগ কম-বেশী সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে থাকলেও মাদ্রাজ, অন্ধ্র, উড়িষ্যা, বিহার, পশ্চিম বাঙলা আর মহারাষ্ট্রেই সব চাইতে ব্যাপক।

রোগটা অত্যন্ত খারাপ হলেও কুষ্ঠরোগের জীবাণু বড় বেশী দুর্বল। কাপুরুষ। টিউবারকিউলোসিসের সমগোত্রীয় হলেও চট করে কাউকে পরাজিত করতে পারে না। এরা মানুষের দেহে আসার চার থেকে চল্লিশ বছর পর কুষ্ঠরোগ আত্মপ্রকাশ করে। আমার বেশ মনে আছে ডক্টর ভৌমিক লেপ্রসী সম্পর্কে লেকচার দেবার সময় আমাদের বলেছিলেন, হঠাৎ কারুর প্রেমে পড়ে একটা রাত তার সঙ্গে কাটাবার পর যদি জানতে পার তার লেপ্রসী আছে, তাতে ভয় পেও না। কিচ্ছু হবে না, বাট, মাসের পর মাস যদি তার সঙ্গে একই বিছানায় রাত কাটাতে শুরু কর, তাহলে দুজনকেই গৌরীপুর লেপ্রসী কলোনীতে পাঠাতে হবে।

এসব ছাড়াও জানি প্রথম থেকে চিকিৎসা শুরু করলে এ রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভব। যত দেরি হবে তত বেশী সময় লাগবে। ডি-ডি-এস আবিষ্কার হবার পর কুষ্ঠরোগী এলে ডাক্তাররা আর ঘাবড়ে যান না।

বইপত্তরের দু'চার পাতা মুখস্থ করে, ডাঃ ভৌমিকের লেকচার শুনে এসব জেনেছি, শুনেছি। মেডিক্যাল কলেজের আউটডোরে ডিউটি দেবার সময় কদাচিৎ কখনও দুটো-একটা রুগী দেখেছি। বলেছি ট্রপিক্যালে যেতে। এছাড়া পথেঘাটে কিছু হতভাগ্যদের দেখেছি। কুষ্ঠরোগ ও রোগী সম্পর্কে আমার এইটুকুই বিদ্যাবুদ্ধি। সাধারণ এম. বি, বি, এস, ডাক্তার আর কি জানবে? অভিজ্ঞতা থাকলে অবশ্য আলাদা কথা।

অভিজ্ঞতা সত্যিই অমূল্য সম্পদ। নতুন হাউস সার্জেন হয়ে লেবার ওয়ার্ডে ডিউটি দিচ্ছি। মাঝে মাঝেই আমরা তিন-চারজন ডাঃ সরকারের চারপাশে বসে মজার মজার গল্প শুনছি। হঠাৎ মালতী ছুটে এসে ডাঃ সরকারকে বলল, স্যার, শিগগির একটু আসুন।

ডাঃ সরকার চুরুটে টান দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

বেড নাম্বার সেভেন্টিটুর যে পেসেন্টকে লেবার রুমে নিয়ে গেছি…

কি হয়েছে তার?

আই থিঙ্ক সী ইজ গোয়িং টু হ্যাভ ইট ভেরী সুন!

আর ইউ সুওর?

কণ্ডিসন দেখে তাই তো মনে হল।

ডাঃ সরকার অ্যাশট্রের উপর চুরুটটা রেখে আমাদের বললেন, কাম অন বয়েজ অ্যাণ্ড গার্লস, ডাঃ মালতী ব্যানার্জীর পেসেন্ট দেখে আসি।

ডাঃ সরকারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই লেবার রুমে ঢুকে দেখি ব্যথায় মেয়েটি পাগল হবার উপক্রম। পেসেন্টের পাশে মিনিট খানেক থেকেই ঘুরে দাঁড়ালেন ডাঃ সরকার। বললেন, এস, মালতী এস।

নিজের ঘরে এসে অ্যাশট্রে থেকে চুরুট তুলে নিয়েই ডাঃ সরকার বললেন, তোমার জন্য চুরুটটা নিভে গেল তো!

মালতী লজ্জা পেল।

ডাঃ সরকার আবার চুরুট ধরিয়ে দুটো-তিনটে টান দিয়ে বললেন,

বিয়ের পরের প্রথম এক মাসের টোটাল প্লেজারকে এক হাজার দিয়ে মালটিপ্লাই কর।

বিয়ের প্রথম এক মাসের সমস্ত আনন্দকে এক হাজার দিয়ে গুণ করব? শুনেই আমরা সবাই মুখ টিপে টিপে হাসতে শুরু করলাম।

আবার চুরুটে টান দিয়ে বললেন, এবার একটা বড় দাঁড়িপাল্লা আনো।

আমরা চুপ।

দাঁড়িপাল্লার একদিকে ঐ টোটাল আনন্দ চাপাও আর অন্যদিকে ঠিক ইকুয়াল অ্যামাউন্টের দুঃখ-যন্ত্রণা চাপাও। চুরুট টানতে টানতে ডাঃ সরকার মালতীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ডক্টর মিস ব্যানার্জী, ঐ দাঁড়িপাল্লা সমান না হলে তো তোমার পেসেন্টের বাচ্চা হবে না!

ডাঃ সরকারের কথায় আমরা সবাই না হেসে পারলাম না। মালতীও হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, বাট স্যার সী ইজ হ্যাভিং...

ডাঃ সরকার মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, মাই ডিয়ার ইয়াং গার্ল! এর মধ্যে আর কোন ইফস্ অ্যাণ্ড বাট্‌স নেই। খুব ভাল করে চুরুটে একটা টান দিয়ে বললেন, স্ফূর্তি করার সময় তো কাণ্ড-জ্ঞান থাকে না, কিন্তু ডাক্তারী করতে হলে সুখ-দুঃখ দুটোরই হিসেব রাখতে হয়।

মালতী আবার লেবার রুমে যাচ্ছিল কিন্তু ডাঃ সরকার ডাকলেন, এস, এস, লেট আস হ্যাভ কফি টুগেদার। আরও নাইন্টি-টু-হানড্রেড মিনিটস-এর আগে তোমার পেসেন্টের কিচ্ছু হবে না।

পেসেন্টের অবস্থা দেখে মালতীর মত আমাদেরও মনে হয়েছিল দু-এক মিনিটের মধ্যেই ডেলিভারী হবে বা করাতে হবে কিন্তু সত্যিই হল না। ঠিক এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট আড্ডা দেবার পর ডাঃ সরকার উঠলেন, চল মালতী, তোমার পেসেন্টের কি হল দেখা যাক। লেবার রুমে যাবার কুড়ি মিনিট পরেই মালতীর পেসেন্টের বাচ্চা হল।

রোগ বা রুগী সম্পর্কে এই ধরনের অভিজ্ঞতা সবার হয় না। হতে

পারে না। কুষ্ঠরোগীর মনের জ্বালা, প্রাণের দুঃখের খবর আমি কেমন করে রাখব? সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ সে খবর রাখেন। জানেন। আরতিদির স্বামী অলোকবাবুর আত্মহত্যার কাহিনী শুনে আমিও কিছুটা অনুমান করলাম। জানতে চাইলাম, দিদি এখানে এলেন কি করে?

আফটার দ্যাট ট্রাজেডি দিদিও ঐদিনই সুইসাইড করতে গিয়েছিলেন কিন্তু ডাঃ ঘোষের জন্য পারেননি···

দু'হাত দিয়ে আরতিকে চেপে ধরে ডাঃ ঘোষ বললেন, আমি যদি তোমার স্বামীকে ভর্তি না করতাম তাহলে তো এই সর্বনাশ হত না!

শোকবিহ্বল আরতি হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, না না, ডাক্তারবাবু, আমিই ওকে মারবার জন্য এখানে নিয়ে এসেছিলাম। আমিই ওকে মেরেছি ডাক্তারবাবু, আর কেউ না·

পাগলের মত কি বলছ আরতি? তুমি তো ওকে ভাল করবার জন্য···

মিছে কথা ডাক্তারবাবু! আমিই ওকে মার্ডার করেছি। আমার ফাঁসি হবে···না, না, ডাক্তারবাবু, তার আগেই আমি নিজেকে মেরে ফেলব।

ছোটবেলায় মেয়েরা পুতুল খেলা করে। বর সাজায় বৌ সাজায় বিয়ে দেয় বৌভাত ফুলশয্যা হয়। ছোট্ট ছোট্ট লুচি ভেজে দেন মা বা দিদি। কত মজা হয়। চার-পাঁচ-ছ বছর ধরে এই খেলা চলে। অনেকে আরো বেশী দিন ধরে খেলে কিন্তু আরতি স্বামীকে নিয়ে দেড় বছরও খেলতে পারল না। জুলাইতে কলেজে ভর্তি হবার এক মাসের মধ্যেই বিয়ে হল। চোদ্দ মাসেই চোদ্দ কলা পূর্ণ করতে হল আরতিকে। ডাঃ ঘোষও ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন। মহাষ্টমীর ঢাকের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দিয়ে ডাঃ ঘোষ চিৎকার করলেন, আরতি! তুমি মরতে পার আর আমি মরতে পারি না?

হঠাৎ আরতির কান্না থেমে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ল ডাঃ ঘোষের

বুকের উপর, না না, ডাক্তারবাবু আপনাকে আমি মরতে দেব না।

সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌ একটু হেসেই বললেন, সেইদিন থেকেই দিদি ডাঃ ঘোষের মেয়ে হয়ে গেলেন।

অনেক দুঃখের পরও খুশিতে একটু ঝলমল করে উঠলাম, তাই নাকি?

হ্যাঁ ডক্টর। দিদি ডাঃ ঘোষকে বাবা, মিসেস ঘোষকে মা বলেই ডাকেন।

ওঁরা এখন কোথায়?

ডাঃ ঘোষ পাঁচ বছরের জন্য ওয়ার্লড হেলথ অর্গানিজেশনে গিয়েছেন বলেই দিদি আমার এখানে আছেন। উনি ফিরে এলেই দিদি ওঁদের কাছে চলে যাবেন।

কিন্তু দিদির আত্মীয়-স্বজনরা···

আমাকে কথাটা শেষ করতে হল না। সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌ মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, না ডক্টর, তারা কেউ ওকে চায় না। অলোকবাবুর লেপ্রসী হয়েছিল শুনেই সবাই দূরে সরে গেছে।

কিন্তু দিদির তো কিছু হয়নি?

সী ইজ অ্যাবসোলিউটলি নর্ম্যাল।

হঠাৎ দিদি ভিতর থেকে বারান্দায় এসে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আর কত গল্প করবেন? এবার খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিন!

আমি হাসি চেপে বললাম, কিছু খাব না।

দিদি ঘাবড়ে গেলেন, কেন? শরীর খারাপ লাগছে?

শরীর ঠিকই আছে।

তবে?

আমি আসার পর এক মিনিটের জন্যও আপনি আমার সঙ্গে কথা বলেননি। আপনার রান্না আমি খাব কেন?

দিদি হাসলেন। বললেন, কাজ করছিলাম যে।

সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌ হাসতে হাসতে বললেন, দিদি, একটু বসুন।

দিদি বসলেন কিন্তু বললেন, ছুটো বেজে গেছে।

আমি বললাম, বাজুক।

দিদি মুখ নীচু করে হাসতে হাসতে বললেন, ডাঃ রায় তো চলে গিয়েছেন। তাঁর জায়গায় আপনি এলে তো ভালই হয়।

কিন্তু আমাকে কে চাকরি দিচ্ছেন?

সিস্টার ফাদারের কাছে নিয়ে গেলেই হয়ে যাবে।

যদি না হয়?

হবেই।

তিন

মানুষগুলোর চেহারা দেখলেই বোঝা যায় আমাদের মত এরা পৃথিবীর নতুন বাসিন্দা নয়। কুমারটুলির প্রতিমার মত আমরা সুন্দর চকচকে-ঝকঝকে। আর ওরা? যুগযুগান্তরের পুরনো শিলামূর্তি। এবড়ো-খেবড়ো ও কালো। দেখে ভাল না লাগলেও ইতিহাসের পাতা ভরে রেখেছে ওরা। আমরা চৌরঙ্গীর মিউজিয়ামে গিয়ে তাম্র-প্রস্তর যুগের মালমশলা দেখে উত্তেজিত হই। আর ওরা? ওরা হয় না। হবে না। ওরা তারও বহু আগের নবোপলীয় যুগ ছাড়িয়ে পুরোপলীয় যুগের মানুষ। মানবসভ্যতার প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের নায়ক।

শুধু মানুষগুলো কেন, পুরুলিয়ার মাটির উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেও একথা জানা যায়। সবুজ, শ্যামল, রসময় বাঙলার জমি পশ্চিমের দিকে এসেই অন্য চেহারা। শুরু হয়ে যায় কোমল-কঠোরের লুকোচুরি। লালিত্যের মাঝেও শত-সহস্র বছরের পৌরুষ আর ঐতিহ্য উঁকি দিচ্ছে। শাল-পলাশ মহুয়া-আমলার ঘন অরণ্যের পরই বন্ধুর পার্বত্য ভূমির নৃত্য। পাহাড়ের পর পাহাড়। অজস্র, অনেক। তবে ছোট ছোট। হঠাৎ দেখলে মনে হয় অশান্ত দুরন্ত সমুদ্র যেন পাগলামি করতে করতে এসে সাঁওতাল-বাউরী-কুর্মী-মুণ্ডাদের

ভয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে।

ভোরের আবছা আলোয় যখন চারপাশে তাকিয়ে দেখি, দেখি ছোটখাটো পাহাড় আর ম্লান শাল-পলাশের বন। তখন মনে হয় যুগ-যুগের ক্লান্তি বুকে নিয়ে মা আলুথালু হয়ে ঘুমুচ্ছেন। চুল খোলা। বুকের কাপড় সরে গেছে। শত সহস্র বছর ধরে লক্ষ কোটি সন্তানকে লালন-পালন করার জন্য স্তনের প্রাণধারা, রসধারা শেষ।

ভোরবেলায় ওঠা আমার বরাবরের অভ্যাস। এখানে চাকরি নেবার পর আরো ভোরে উঠি। আমার সামনের বাড়ির পি-ডবলিউ-ডি'র এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার সাহেবের মত বেড়াতে যাই না। সামনের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে দু'চোখ ভরে চারপাশে তাকিয়ে দেখি। কলকাতায় ভোরবেলায় উঠলেও চারপাশের মানুষ দেখার সুযোগ নেই। এক কাপ চা আর একখানা খবরের কাগজ দু চোখের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে আর কিছু দেখতে দেয় না।

মহাদেব এত ভোরে ওঠে না। আমিও কিছু বলি না। বারান্দায় এসে বসতে না বসতেই পাশের সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌-এর কোয়ার্টার থেকে দিদি চা নিয়ে হাজির, দাদা, চা।

চাকরি নিয়ে এখানে আসার পর দিদির সঙ্গে আমার একটা চুক্তি হয়, দিদি, আমাকে যদি দাদা হতে হয় তাহলে ঐ আপনি, চা পান চলবে না।

কিন্তু···

কিন্তু থাকলে তো দাদা-দিদির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না।

চায়ের কাপটা পাশে রেখেই দিদি রোজ আমাকে একটা প্রণাম করেন। এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েও শেষ পর্যন্ত দিদির চোখের দু'ফোঁটা জলের কাছে হেরে গেছি—বাবা-মা তো ইউরোপে। এখন তোমাকে ছাড়া আর কাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইতে পারি বল তো?

দিদি প্রণাম করলেও আমি প্রবীণদের মত ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে পারি না। কি আশীর্বাদ করব? শুধু আশীর্বাদ

কুড়িয়েই কি ওর জীবন কাটবে? দিদি মীনুর বয়সীই হবে। হয়তো ওর চাইতে দু-এক বছরের বড় কিন্তু তার বেশি নয়। শুধু স্নেহ আর আশীর্বাদ নিয়েই তো কোন ছেলেমেয়ের জীবন কাটতে পারে না। এই হতভাগিনী কি প্রেম-ভালবাসার স্বাদ আর কোনদিন পাবে না? মাঝে মাঝে মনে হয় দিদি বলে না ডাকলেই ভাল হত।

মনে মনে কি আশীর্বাদ করলে?

চায়ের কাপে একবার চুমুক দিয়েই বলি, ভগবানকে বললাম, দিদি কি চিরকালই এমনি মজায় দিনগুলো কাটাবে?

দিদি হাসে। বলে, তা ভগবান কি জবাব দিলেন?

বললেন, পুরুলিয়ার ডেভলপমেণ্ট প্রজেক্টস নিয়ে ইন্দিরার সঙ্গে আলোচনার জন্য দিল্লী যাচ্ছি। ফিরে এসে আরতির ফাইলটা দেখব।

দিদি হাসে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, কাল রাত্রে কখন ঘুমুতে গেলে?

এগারোটা, সাড়ে এগারোটা হবে, বোধ হয়।

তোমার কি মাথা খারাপ?

কেন?

আমিই তো সাড়ে বারোটা, পৌনে একটা পর্যন্ত তোমার ঘরে আলো দেখেছি। বই পড়ছিলে, নাকি মাকে চিঠি লিখছিলে?

কৃষ্ণকান্তের উইল পড়ছিলাম।

তোমার পড়া হলে আমাকে দিও তো।

আমার চা খাওয়া শেষ হয়। চায়ের কাপ-প্লেট হাতে নিয়ে দিদি চলে যায়।

কোন-কোনদিন দিদি চা নিয়ে আসতে-না-আসতেই ওপাশ থেকে ডাঃ সাহানী এসে হাজির হন। দিদি সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কাপটা ওঁকে দেন, নিন বড়দা, আমি দাদার চা নিয়ে আসছি।

ডাঃ সাহানী চায়ের কাপ হাতে নিয়েই বলেন, তোমার দাদা যদি রাগ করে?

আমার দাদা-বড়দা কেউই অত মীন-মাইণ্ডেড না।

দিদি দু-এক পা এগুতেই ডাঃ সাহানী ডাক দেন, শোন আরতি শোন। একটা কথা বলে যাও।

কি বলুন?

তুমি আমাকে না অজয়কে—কাকে বেশী ভালবাস?

কাউকে না। দিদি আর দাঁড়ায় না। চলে যায়।

ডাঃ সাহানী চা খেতে খেতে বলেন, জানো অজয়, লেপ্রসী হাসপাতালে চাকরি করে আর কিছু পাই আর না পাই মানুষের ভালবাসায় মন ভরে যায়।

আপনি যে ওদের দারুণ ভালবাসেন।

না না, অজয়, তুমি ভুল করছ। আমি আগে ওদের ভালবাসিনি, ওরা এমন করে আমাকে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরে যে ওদের ভাল না বেসে উপায় নেই। লেপ্রসী পেসেণ্টদের মত আর কেউ ডাক্তারদের এত ভালবাসে না।

আগে আমার কোন ধারণাই ছিল না···

প্রথম দিন চাকরি শুরু করার আগেই রেভারেণ্ড ঘোষ আমাকে বললেন, সব ডাক্তারই চিকিৎসা করতে পারে কিন্তু সব ডাক্তার রুগীদের ভালবাসতে পারে না। আমার রুগীদের আগে ভালবাসবে, তারপর চিকিৎসা করবে।

বৃদ্ধ রেভারেণ্ড ঘোষের কথার মর্ম তখনও বুঝিনি। ডাঃ সাহানীর সঙ্গে দিনের পর দিন রুগীদের দেখতে দেখতে বুঝতে পারলাম।

কি মিত্তিরদা, ভাল আছেন তো? মেল ওয়ার্ডে ঢুকেই সামনের বেডের সামনে দাঁড়িয়ে ডাঃ সাহানী জিজ্ঞাসা করলেন।

ভাল আর কোথায়? আজ প্রায় এক মাস মণিকার কোন চিঠি আসছে না।

ডাঃ সাহানী বকুনি দিয়ে উঠলেন, এক মাস কোথায় হল? দশ-বারোদিন আগেই তো বৌদির চিঠি এল।

দশ-বারোদিন না, এক মাস হবে।

আমি চিঠি এনে আপনাকে দেখাব?

পুরনো চিঠি দেখে আর কি করব? আপনি যোগমায়াকে বলে দেবেন চিঠি এলেই যেন

মিত্তিরদার কথা শেষ করার আগেই আমি বলি, চিঠি আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিজে নিয়ে আসব।

ডাঃ সাহানী হাসতে হাসতে বললেন, দেখছেন মিত্তিরদা, অজয়ও আপনাকে কেমন ভালবাসে?

মিত্তিরদা একবার আমার দিকে তাকিয়েই আপন মনে বললেন, হি ইজ রিয়েলি এ ভেরী গুড ডক্টর।

ডাঃ সাহানী অন্য বেডের দিকে এগুতে এগুতে বললেন, তার মানে আমাকে আর ভাল লাগছে না। ঠিক আছে, আমি আর আপনার কাছে আসব না।

উনি এগিয়ে গেলেও আমি মিত্তিরদাকে ছেড়ে যেতে পারি না।—দেখছেন ডাঃ সরকার, এই সামান্য কথায় ডাক্তার সাহেব কেমন রাগ করে চলে গেলেন?

রাগ না, একটু অভিমান হয়েছে আর কি।

আপনাকে ভাল বলা মানেই কি উনি খারাপ?

না না, তা কেন হবে?

আসলে মণিকার চিঠিপত্তর না পাবার জন্যই মনটা বড় আপসেট হয়ে আছে।

আমি প্রসঙ্গটায় যবনিকা টানবার জন্য মুখ নীচু করে ফিস ফিস করে মিত্তিরদাকে বললাম, আপনাদের নিশ্চয়ই লাভমারেজ হয়েছিল, তাই না?

মিত্তিরদা হাসতেই আমি অন্য পেসেন্ট দেখার জন্য ডাঃ সাহানীর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। অন্য রুগী দেখি, ডি-ডি-এস এর ডোজ একটু বাড়িয়ে দিই কিন্তু মিত্তিরদার কথা ভুলতে পারি না।

পুরো নাম অমরনাথ মিত্র। প্যাডের পাতায় ছাপাতেন এ. এন.

মিত্র, বি. এস-সি. বি. ই.। এখনও মিত্তিরদার বালিশের তলায় হাত দিলে ঐ প্যাডের অনেকগুলো কাগজ পাওয়া যাবে। উনি যদি হঠাৎ রেগে যান তাহলে নিজেই বালিশের নীচে হাত দিয়ে প্যাডের কাগজগুলো এগিয়ে ধরে বলেন, ডোণ্ট ফরগেট ডক্টর, আই অ্যাম এ. এন. মিত্র, বি. এস-সি. বি. ই.।

মিত্তিরদাদের বাড়ির অবস্থা ভালই ছিল। আদি বাড়ি বরিশাল হলেও ওঁরা বহুকাল জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। ছোটখাটো কয়েকটা চা-বাগান ছাড়াও শিলিগুড়িতে একটা স্য-মিল ছিল। মিত্তিরদার সঙ্গে ওর বাড়ির বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। মা ছিলেন না। বাবা টাকা পাঠাতেন আর উনি কলকাতায় শিবপুরে পড়াশুনা করতেন।

শিবপুর থেকে পাস করে বেরুবার পর বছর দুই বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের পি-ডবলিউ-ডি ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করতে করতেই কয়েকজন কনট্রাক্টরের সঙ্গে বড় বেশি ভাব হয়ে গেল। দিলেন চাকরি ছেড়ে। ছোট ভাইয়ের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও বাবার কাছ থেকে প্রায় লাখখানেক টাকা নিয়ে পার্টনারশিপে ব্যবসা শুরু করলেন। তখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জোয়ার বইছে সারা দেশের উপর দিয়ে। পশ্চিমবাঙলা-বিহার সীমান্তে বিরাট কর্মচাঞ্চল্য। মিত্তিরদা কাজের নেশায়, টাকার নেশায় বিভোর।

একবার হাজারিবাগ ডাকবাংলোয় রাত কাটাতে গিয়ে কলকাতার এক ব্যারিস্টার সাহেব,তাঁর স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে আলাপ হল মিত্তিরদার। এক বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই ঐ ব্যারিস্টার-নন্দিনী মণিকার সঙ্গে মিত্তিরদার বিয়ে হল।

ডাঃ সাহানীর কাছে মিত্তিরদার কাহিনী শুনে চমকে উঠি। আজ পুরুলিয়া লেপ্রসী মিশনের বহুদিনের পুরনো রুগী মিত্তিরদাকে দেখে কে বলবে উনি বি. এস-সি. বি. ই.? কে বলবে উনি লক্ষপতি ব্যারিস্টারের একমাত্র সন্তান মণিকার স্বামী?

ডাঃ সাহানী শূন্য কফির কাপ পাশে রেখে বললেন, বিয়ের পর শ্বশুরের কাছ থেকে অনেক টাকা পেলেন মিত্তিরদা। পার্টনারশিপ

ছেড়ে নিজেই ব্যবসা শুরু করলেন। পার্টনারদের ছেড়ে একলা একলা ব্যবসা শুরু করার পর মিত্তিরদার ঘোরাঘুরি আরও বেড়ে গেল। বিশেষ করে রাউরকেল্লা স্টীল প্ল্যাণ্টে পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকার কনট্রাক্ট পাওয়ায় ওঁকে অনেক সময়ই ওখানে থাকতে হত।

তার মানে মিত্তিরদা এককালে বিগ বস ছিলেন?

একশোবার। মিত্তিরদার রাউরকেল্লা অফিসের ম্যানেজার কত মাইনে পেতেন জানো? সতেরশো টাকা।

বলেন কি?

যা বলছি ঠিকই বলছি। এই মাইনে ছাড়াও মিত্তিরদা তাকে বাড়ি আর গাড়ি দিয়েছিলেন।

আপনি না বললে আমি তো কল্পনাও করতে পারতাম না।

তুমি কেন, কেউই পারবে না। মিত্তিরদা যখন আমাকে এসব বলেছিলেন তখন আমিই কি বিশ্বাস করেছিলাম? ভেবেছিলাম সব বাজে কথা।···

এসব যে সত্যি তা জানলেন কেমন করে?

মিত্তিরদা এখানে ভর্তি হবার পর ওর সেই ম্যানেজারও এসেছিলেন। তাঁর কাছেই শুনেছি।

কিন্তু ওর লেপ্রসী হল কবে?

ডাঃ সাহানী হাসলেন, বললেন, কোন ভাবে ঐ ম্যানেজারের স্ত্রীরই প্রথম কুষ্ঠ হয় কিন্তু কেউ জানতে পারে না। এমন কি উনি নিজেও বহুদিন ধরতে পারেন না, আর ঐ ভদ্রমহিলার সঙ্গে মিত্তিরদার···

আমি বাধা দিই, অমন ব্যারিস্টারের মেয়েকে বিয়ে করা সত্ত্বেও ··

স্ত্রীকে আর কাছে পেতেন কোথায়?

কিন্তু ম্যানেজার কি ভাবে টলারেট করত?

স্টীল, সিমেণ্ট আর ব্যাঙ্কের ঝামেলা সামলাতে ম্যানেজারকে তো মাসে পনেরো-বিশ দিন বাইরে বাইরেই কাটাতে হত আর সেই অবসরে কর্মবীর মিত্তিরদাই কলিঙ্গের মসনদ দখল করলেন।

মিত্তিরদার স্ত্রী এসব জানতেন ?

তখন জানতেন না, পরে সব কিছু জেনেছিলেন। জেনেছিলেন তাঁর স্বামী চরিত্রহীন আর তাঁর বাবার কয়েক লক্ষ টাকা উড়িয়েছেন। তাই তো স্বামী কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হয়ে পুরুলিয়া লেপ্রসী হোম-এ ভর্তি হবার পর মাত্র একবার এসেছিলেন। অধিকাংশ রুগীর মত মিত্তিরদাও লুকিয়ে, কাউকে না জানিয়ে এখানে ভর্তি হয়েছিলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে স্ত্রীকে দেখেই চমকে উঠেছিলেন, তুমি ?

হ্যাঁ, আমি। কোন উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করে মিত্তিরদার স্ত্রী জবাব দিলেন।

কোন চিন্তা করো না মণিকা। আমি খুব তাড়াতাড়িই ভাল হয়ে যাব।

মিসেস মিত্র একটু হাসলেন। মিত্তিরদা মুখ নীচু করে কথা বলছিলেন। উনি স্ত্রীর হাসিটুকু দেখতে পেলেন না। একটু থেমে আবার বললেন, কুলি-টুলিদের নিয়ে কাজকর্ম করতে গিয়েই রোগটা বাধালাম। তবে সিরিয়াস কিছু নয়। কিন্তু মণিকা, তুমি এখানে খুব বেশি আসা-যাওয়া করো না।

ভয় নেই, আমি বেশি আসা-যাওয়া করব না। শুধু একটা জরুরী খবর দেবার জন্যই এসেছি।...

কি মণিকা ? কি ?

হাজার হোক ব্যারিস্টারের মেয়ে। ভাবাবেগহীন বিচারপন্থ র কিছু খবর রাখেন। জজ সাহেবদের মত গম্ভীর হয়ে মিসেস মিত্র বললেন, যে সুন্দরীর সঙ্গে কয়েক বছর এক বিছানায় শুয়ে রোগটা বাধিয়েছ তিনিও গৌরীপুর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

মিত্তিরদা আর মুখ উঁচু করতে পারেননি।

মিত্তিরদার স্ত্রী চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, শুধু এই খবরটা তোমাকে পৌঁছে দেবার জন্য এত পেট্রোল নষ্ট করে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

ডাঃ সাহানী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, হ্যাট ওয়াজ হার

ফার্স্ট অ্যাণ্ড লাস্ট ভিজিট। আর কোনদিন আসেননি।

চিঠিপত্র ?

মিত্তিরদার চোখটা যখন ভাল ছিল তখন উনি চিঠি লিখতেন কিন্তু একটি চিঠিরও জবাব আসেনি।

তবে যে মিত্তিরদা কেবল চিঠি-চিঠি করেন ?

গত কয়েক বছর ধরে উনি মুখে বলে যান আর আমরা চিঠি লেখার ভান করি। আবার যে কোন একটা ইনল্যাণ্ড খামের চিঠি এনে বলি ওঁর স্ত্রীর চিঠি।

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি না।

ডাঃ সাহানীই আবার কথা বলেন, মিসেস মিত্র এখান থেকে ফিরে গিয়েই দশ হাজার টাকার একটা চেক আমার কাছে পাঠিয়ে লিখেছিলেন—দিস ইজ এ টোকেন ডোনেশান টু ইওর গ্রেট ইনিস্টিটিউশন।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আর মিত্তিরদার ব্যাঙ্কে জানিয়ে দেন যে উনি এখানে আছেন। এখনও মিত্তিরদার ব্যাঙ্কের স্টেটমেণ্ট আমাদের এখানেই আসে। ওঁকে দেখে ভিখারী মনে হলেও ব্যাঙ্কে বেশ টাকা আছে।

বলেন কি !

ঠিক মনে নেই, তবে লাস্ট স্টেটমেণ্টে বোধ হয় দেখেছিলাম লাখ দুই টাকা আছে। মিত্তিরদার বিছানার তলায় সব স্টেটমেণ্ট রাখা আছে, একদিন দেখে নিও।

ওঁর স্ত্রীর কোন খবর রাখেন ?

ডাঃ সাহানী হাসলেন।—সী হ্যাজ ম্যারেড এ ডক্টর। অ্যাণ্ড হার প্রেজেণ্ট হ্যাসব্যাণ্ড ডাঃ বিমল রায়চৌধুরী আর আমি একই সঙ্গে লখনৌ কিং জর্জ মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করি। ডাঃ সাহানী তখনও হাসছেন।

আমার হাসি, প্রশ্ন সব থেমে গেছে।

ডাঃ সাহানীও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন, জানো অজয়, মণিকাকে

আজও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। সী ইজ ভেরী হ্যাপি অ্যাণ্ড সো ইজ মাই ফ্রেণ্ড বিমল। একটা মেয়ে হয়েছে। নাম বলাকা। কিন্তু মণিকা এখনও মাঝে মাঝে আমাদের এখানে কিছু-না-কিছু ডোনেশান পাঠিয়েই যাচ্ছে।

আমি হাসি।

ওয়ার্ড থেকে বেরুতে গিয়েই ডাঃ সাহানী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বংশীর মুখের সামনে মুখ নিয়ে বললেন—

আমার টুসু ঘূড়ি ভাজে চুড়ি ঝন্‌ঝন্‌ করে।
ওদের টুসু ছছ্‌রা মেয়ে আঁচল পেতে মাগে।

খুশিতে বংশীর সারা মুখ হাসিতে ভরে গেল।

সামনের টুসুতে গাইবি তো?

আপনি ছুটি দিলে আজই গাইতে পারি।

এখন কি টুসুর গান শোনার সময়?

অন্য গান শোনাব।

তোকে ছুটি দিলে কি তুই আর আমাকে গান শোনাতে আসবি?

আমি কি ভেঠর না ভাড়ুয়া যে আপনাকেও ভুলে যাব?

আমি বংশীর মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, তোকে ডাক্তার সাহেব ক্ষেপাচ্ছেন, তাও বুঝলি না?

বংশী আবার হাসে। বলে, তা আমি জানি।

ইদানীং বর্ডার লাইন পেসেণ্টের সংখ্যা বেশ বাড়ছে। টিউবার-কুলার আর বর্ডার লাইন পেসেণ্টেদের হাত-পায়ের আঙুল কুঁকড়ে যায়। মানুষ বিকলাঙ্গ হতে শুরু করে। অসুস্থ হবার ছ'মাস—এক বছরের মধ্যেও এরা হাসপাতালে ভর্তি হলে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যায়।

কুষ্ঠের জীবাণু আস্তে আস্তে মানুষের স্নায়ুগুলোকে অকেজো করে দেয়। একদিকের স্নায়ুগুলো মরে গেলে অন্যদিকের স্নায়ুগুলোর

টানে হাত-পা'র আঙ্গুলগুলো কুঁকড়ে যেতে শুরু করে। ছ'মাস এক বছর চিকিৎসার পর অপারেশন করলে পেসেন্ট একেবারে স্বাভাবিক হবেই। এ ধরনের অপারেশন নিত্যই এখানে হচ্ছে। ডাঃ সাহানীই অপারেশন করেন। আজও একটা বাচ্চা মেয়ের অপারেশন আছে বলে আমিই অন্যান্য ওয়ার্ডগুলো ঘুরতে গেলাম।

ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকতে গিয়েই দেখি পিসী নীচে গিয়ে ঘাস তুলছেন। খালি পা। দেখেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কোনমতে নিজেকে সংযত করে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি ওখানে কি করছেন?

কয়েকটা দুর্বো ঘাস তুলছি।

পায়ে জুতো আছে? ঠাকুরের জন্য তুলছি বলে···

না।

জুতো কোথায়?

বেডের নীচেই আছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বেডের নীচে থেকে জুতো নিয়ে পিসীকে দিয়ে বললাম, আর যেন কখনও খালি পায়ে দেখি না।

আমি সব পেসেন্টকেই একটা-না-একটা নাম দিয়েছি। সেই নামেই ওঁদের ডাকি। ওঁরা খুশি হন। পেসেন্ট-ডাক্তারের মধ্যেও একটা আত্মীয়তার গন্ধ পাওয়া যায়। পিসী বিধবা ও বয়স্কা। ওঁর বালিশের নীচে ঠাকুর-দেবতার ছবি আছে। সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পূজা হয়। তিথি-পার্বণের দিন পিসী কাউকে দিয়ে সামান্য একটু মিষ্টি কিনিয়ে আনেন। পূজার পর সেই প্রসাদ বিতরণ করেন ওয়ার্ডের অন্যান্য পেসেন্টদের। সবাই সশ্রদ্ধ চিত্তে সে প্রসাদ নেন। এমন কি আমার গ্র্যাণ্ড মাম্মী পর্যন্ত।

পিসী জুতো পায়ে দিয়ে বেডে ফিরে আসতেই আমি যে কথা ওঁকে বহুবার বলেছি সেই কথাই আবার বললাম, পিসী, আসল অসুখটাই আপনার পায়ে হয়েছে। আপনার ডান পায়ের গোড়ালির নীচে ব্লেড বা পেরেক পড়লেও আপনি টের পান না, তাই না?

পিসী মাথা নাড়লেন।

আপনার পায়ে আল্‌সার শুরু হলেও বেশী ক্ষতি হবার আগেই সারানো হয়েছে, তাই তো ?

পিসী আবার মাথা নাড়লেন।

এখনও আপনার গোড়ালিতে পেরেক ফুটিয়ে দিলেও আপনি জানতে পারেন না। খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করে যদি আবার আলসার হয় তাহলে কি ভাল হবে ?

পিসী কোন কথা বলেন না। বলবেন কি ? সবই তো উনি জানেন। জানেন কুষ্ঠ হলে কোন অনুভূতি থাকে না। কেটেকুটে গেলেও ব্যথা লাগে না, কিন্তু ক্ষতি তো হয়। কিছুকাল উপেক্ষা করলেই আল্‌সার হবে। কুষ্ঠরোগের জীবাণু আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারের মত ঢিক ঢিক করে চললেও আল্‌সার মেল ট্রেনের মত উড়ে চলে। তার ফলে অপারেশন থিয়েটারে পায়ের একটা অংশ চিরকালের মত ছেড়ে আসতে হয়।

আমি একটু ঝুঁকে পিসীর কাঁধে হাত রেখে বলি, দেখলেন তো পিসী, কত চেষ্টা করেও দুর্গার পা-টা বাঁচাতে পারলাম না। ঐটুকু বাচ্চা মেয়ের পা-টা কেটে বাদ দিতে আমাদের কত কষ্ট হয় জানেন।

আমি জানি সুন্দর ফুটফুটে দুর্গা যখন অপারেশন থিয়েটার থেকে দেড়খানা পা নিয়ে ওয়ার্ডে ফিরে এল তখন সবারই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জলও ফেলেছিলেন সবাই।

পিসী একবার বাঁকা চোখে পাশের বেডে দুর্গাকে দেখলেন।

পিসী, ঠাকুর জানেন আপনি হাসপাতালে আছেন, বেডে বসে পূজো করলে যদি দোষ না হয় তাহলে রবারের চটি পায়ে দিয়ে দূর্বা তুললেও পাপ হবে না।

পিসী এতক্ষণে একটি কথা বললেন, পাপ তো হবেই।

পাপ যদি হয় তাহলে আপনার পাপ হবে না, আমার হবে। আমিই তো আপনাকে এ কাজ করতে বলছি। এবারে ওঁর কানে কানে জিজ্ঞাসা করলাম, সব সময় জুতো পায়ে দেবেন তো ?

পিসী মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই আমি দুর্গাকে বললাম,

দেখছিস তো দুর্গা, তুই আমার কথা না শুনলেও পিসী আমার সব কথা শোনেন।

দুর্গা বলল, আমিও তো তোমার সব কথা শুনি।

আমি বেশ গুরুগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, শুনিস ?

শুনি না ? সবাইকে জিজ্ঞাসা কর তো !

তুই আমাকে বাবা বলে ডাকিস ?

দুর্গার সঙ্গে আমার সম্পর্কই আলাদা। সবাই জানেন ওর প্রতি আমার একটু বেশী দুর্বলতা। রোজ ওর সঙ্গে একটু খিটিমিটি না, করলে আমার মন ভরে না। যেদিন আউটডোরে ডিউটি থাকে, এদিকে আসার সময় পাই না, সেদিনও কোয়ার্টারে ফিরে যাবার সময় ফিমেল ওয়ার্ডের সামনের বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে বলি, দুর্গার সঙ্গে আড়ি !

আমি চলে যেতে যেতেই ওর গলা শুনতে পাই, আমিও কথা বলব না।

আমার প্রশ্ন শুনেই দুর্গা ফোঁস করে ছোবল মারে, তোমাকে বাবা বলব কেন গো ? আমার কি বাবা নেই ?

আমি যে তোকে মা বলে ডাকি—

আমি তো ডাকতে বলিনি।

আমি তোকে আদর করি কিনা বল্ ?

আমাকে তো সবাই আদর করে।

ঠিক আছে, আমি মা বলেও ডাকব না, আদরও করব না। তুই আমার সঙ্গে কথাও বলবি না।

দুর্গা ঠোঁট উল্‌টে বলল, আদর না করলে আমিও ওষুধ খাব না।

শুধু আমি নয়, ওয়ার্ডের সবাই ওর কথায় হাসেন। আমি তাড়াতাড়ি ওকে একটু আদর করে কানে কানে জিজ্ঞাসা করি, ওষুধ খাবি তো ?

দুর্গা মাথা নাড়ল।

আমি ওর গাল দুটো টিপে দিয়ে বললাম, লক্ষ্মী মা আমার।

তোকে আদর না করে আমি থাকতে পারি !

এবার আমার একটা হাত এগিয়ে দিয়ে বলি, জোর করে আমার হাতটা চেপে ধর্ তো।

দুর্গা আমার হাতটা চেপে ধরে।

আর চাপতে পারছিস না ?

না।

সব সময় আঙুলগুলো নাড়াস তো ?

হ্যাঁ।

নাড়াবি। ঠিক হয়ে যাবে।

দুর্গার পাশেই পর পর কয়েকজন যুবতী ও বয়স্কা পেসেন্টদের বেড। ওদের বেডের দিকে এক পা এগুতেই দুর্গা জিজ্ঞাসা করল, আমি ভাল হয়ে চলে গেলে তুমি কাকে মা বলে ডাকবে ?

আমি হাসি। ঘুরে দাঁড়াই। গম্ভীর হয়ে বলি, কাকে আর ডাকব ? আর কাউকে মা বলে ডাকতে আমার ইচ্ছাই করে না।

তাহলে ?

তাহলে আর কি করব ? বসে বসে কাঁদব।

বেশ হবে ! যেমন আমার সঙ্গে ঝগড়া কর !

আমি আবার ওকে একটু আদর করে বলি, আর কোনদিন তোর সঙ্গে ঝগড়া করব না। হয়েছে তো ?

দুর্গা সমস্ত রোগযন্ত্রণা ভুলে গিয়ে হাসিতে খুশিতে ভরে ওঠে।

দুর্গার পাশেই তিন দিদির বেড। বড়দি, মেজদি, ছোড়দি। ওদের হাত দেখি, পা দেখি। হাত মুঠো করার চেষ্টা করতে বলি। বড়দির কানের পাশ দেখি, ছোড়দির চোখ দেখি। উন্নতি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু খুব ধীরে ধীরে। এ রোগ আসে যত ধীরে, যায়ও ঠিক তত ধীরে ধীরে। দু-পাঁচ বছরের আগে সাধারণত কোন রুগীকেই ডিসচার্জ করার সৌভাগ্য হয় না।

কি গ্র্যাণ্ড মাম্মী, কি খবর ?

কোয়াইট অল রাইট মাই বয়।

গ্র্যাণ্ড মাম্‌মী ভগবান যীশুর ভক্ত। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্গালোর থেকে এখানে এসেছেন বছর পাঁচেক আগে। এখনও বছরখানেক এখানে থাকতেই হবে। গ্র্যাণ্ড মাম্‌মীর স্বামী বুড়ো মানুষ। প্রায় সত্তর বছর বয়স। তিনি আসেন না, আসতে পারেন না। তুই ছেলে চাকরি-বাকরি সংসার-ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত। বছরে একবারের বেশী আসা সম্ভব হয় না ওদের। প্রত্যেক মাসে একবার করে আসে ওর বড় নাতি জোসেফ। ভারী সুন্দর ছেলে। ঠাকুমার সঙ্গে ওর বড় ভাব, ভালবাসা। প্রত্যেকবার আসার সময় জোসেফ একগোছা ফুল নিয়ে আসে। স্ত্রীকে দাতুর উপহার। জোসেফ ঠাট্টা করে বলে, তোমার স্বামীর এই ফুলগুলো পৌঁছে দেবার জন্যই শুধু আমাকে এখানে আসতে হয়।

গ্র্যাণ্ড মাম্‌মী নাতিকে আদর করে বলেন, তুই ছাড়া আমার জন্য আর কে কষ্ট করবে বল্‌?

জোসেফ একটি মেয়েকে ভালবাসে। মেয়েটির একটা ফটো গ্র্যাণ্ড মাম্‌মীর কাছে আছে। সবাই দেখেছে, আমিও দেখেছি। যখনই সময় পান তখনই উনি ভাবী নাতবৌয়ের ছবি দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে যান। ডু ইউ নো ডক্টর, আমিও বিয়ের আগে ঠিক এই রকম সুন্দরী ছিলাম।

আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

কেন?

এই বয়সেও আপনি যা সুন্দরী তা থেকেই বুঝতে পারি ইয়াং এজে আপনি আরো কত সুন্দরী ছিলেন। জোসেফের গার্ল-ফ্রেণ্ডকে আমার একটুও ভাল লাগে না।

না না, ডক্টর। ওকথা বলো না। সী ইজ ভেরী সুইট। জোসেফের সঙ্গে দারুণ মানাবে।

আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করব না, বাট আই অ্যাম সিওর, উনিশ কুড়ি বছর বয়সে আপনি এর চাইতে অনেক অনেক সুন্দরী ছিলেন।

বাষট্টি বছরের বৃদ্ধা তাঁর রূপের প্রশংসায় খুশি হন। আত্ম-

প্রসাদের সঙ্গে বলেন, নো ডাউট, আই ওয়াজ ভেরী বিউটিফুল—সে সময় কত ছেলে যে আমার পিছনে লেগেছিল ··

তবে ?

তাই বলে এই মেয়েটাকে তুমি খারাপ বলো না ডক্টর। এই মেয়েটিও বড় ভাল, ভেরী হ্যাণ্ডসাম।

পাশের বেড খালি দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, আরে! নাচনী কোথায় গেল ? রাউণ্ডে এসে কোনদিনই কি ওকে বেডে দেখতে পাব না ?

মেজদি বললেন, ও নিশ্চয়ই সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌-এর ওখানে আছে।

নাচনী হঠাৎ ঘরে ঢুকল—আমি বুঝি সব সময়ই মেমসাহেবের কাছে বসে থাকি ?

আমি বকুনি দিয়ে বললাম, ওয়ার্ডে এসে কবে তোর দেখা পাই বলতে পারিস ?

রোজ তো পঞ্চাশবার দেখা হচ্ছে। বেডে না থাকলে বুঝি আর দেখা যায় না ?

ওয়ার্ডে এসে না দেখতে পেলে তোকে আর আমি দেখব না।

না দেখলে আমি বড় ফাদারের কাছে নালিশ করে দেব। তখন বুঝবে মজাটা!

আমি হাসতে হাসতে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে যাই।

নাচনী বারান্দায় বেরিয়ে এসে আমাকে শোনায়, আমাকে দেখলে না তো। আমি ঠিক বড় ফাদারের কাছে নালিশ করে দেব।

ইচ্ছা করে একবার পিছন ফিরে ওকে দেখি, কিন্তু না, দেখি না মুখ টিপে হাসতে হাসতে এগিয়ে যাই।

চার

এই ভাবেই দিনগুলো কেটে যায়। ভালই লাগে। কখনই মনে হয় না চাকরি করছি। কর্তব্যের তাগিদে, প্রাণের টানেই প্রত্যেকটি রুগীকে দেখি। আমি, আমরা না দেখলে আর কে এদের দেখবে?

কলকাতার হাসপাতালে দেখেছি একজন পেসেন্ট ভর্তি হলে কত আত্মীয়-বন্ধু তাকে দেখতে আসেন। ভিজিটিং আওয়ার্সে কোন ওয়ার্ডে ঢোকা যায় না। সব ওয়ার্ডেই মানুষ গিজগিজ করে। ওয়ার্ডের উপচে-পড়া মানুষে বারান্দা পর্যন্ত ভরে যায়। কত গল্প, কত হাসি, কত উপহার। কেউ ফল আনেন, কেউ ফুল। কেউ বা এক প্যাকেট কড়াপাকের সন্দেশ। আরো কত কি। গল্পের বই, উপন্যাস। চিলড্রেন্স ওয়ার্ডের পেসেন্টরা কত খেলনা পায়। শুধু নিজের পেসেন্টকে নয়, আশেপাশের বেডের রুগীরাও এসব সৌভাগ্য ভালবাসার ভাগ পান। আর এখানে?

কয়েক শো পেসেন্ট আমাদের হাসপাতালে কিন্তু রোজ ক'জন আত্মীয়-বন্ধু এদের দেখতে আসেন? কুষ্ঠ হাসপাতালে দর্শকদের আগমন দুর্লভ ঘটনা।

এই যে মেজদি! সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌ নিজে আমাকে বলেছেন, প্রত্যেক উইকে ওঁর স্বামী আসতেন আর কোন একটা ফাঁকা জায়গায় বসে ওঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতেন। ভদ্রলোক রেলের গার্ড, খড়্গপুরেই থাকেন। মাঝরাত্তিরে আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে চেপে সকালে এখানে পৌঁছে সারাদিন এখানে কাটিয়ে আবার সন্ধ্যায় ফিরে যেতেন।

কতকাল আগেকার কথা বলছেন?

আমি এখানে আসার পরের কথা বলছি।

তার মানে বছর ছয়েক আগেকার কথা।

হ্যাঁ, ঐ রকমই হবে। তখন মেজদিকে দেখতে কি সুন্দর ছিল তা

বলতে পারব না। তারপর গ্র্যাজুয়ালি ওর স্বামীর আসা-যাওয়া কম হতে শুরু করল। এখন একেবারেই আসেন না।

প্রায় প্রতিটি রুগীরই একই কাহিনী। আমি চুপ করে থাকি। কি প্রশ্ন করব? সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌ একটু করুণ হাসি হাসলেন। বললেন, যখন আস্তে আস্তে আসা কমাতে লাগলেন তখন উনি মেজদিকে বলতেন ছুটি পান না। তারপর আবার বিয়ে করার আগে বলে গেলেন···

ভদ্রলোক আবার বিয়ে করেছেন? মেজদি জানেন?

অনেক দিন জানতেন না, কিন্তু এসব খবর কি বেশী দিন চাপা থাকে?

উনি কি খড়্গপুরে এখনও আছেন?

হ্যাঁ, কিন্তু মেজদিকে বলেছিলেন আসামের ওদিকে ট্র্যান্সফার হয়েছেন। মেজদির বাবা মা ভাই বোন···

বাবা মা নেই। ভাইটা হোপলেস। ছোট বোন আর তাঁর স্বামী বছরে দু-একবার এসে দেখে যান কিন্তু ওঁরাও বড় গরীব! ওঁদের পক্ষে বেশী আসা-যাওয়াও সম্ভব নয়। মেজদির চিকিৎসা হচ্ছে। অনেকটা ভাল হয়েছেন। হয়তো দেড়-দু বছরের মধ্যেই ওঁকে আমরা ছেড়ে দিতে পারব, কিন্তু সেদিন কি কেউ ওঁকে নিতে আসবেন?

একদিন্‌ কথায় কথায় ডাঃ সাহানী আমাকে বলেছিলেন, যতক্ষণ এরা হাসপাতালে আছে, আমরা চিকিৎসা করছি, ওষুধ খাচ্ছে, পথ্য পাচ্ছে, ততক্ষণ কোন চিন্তা নেই, কিন্তু চিন্তা শুরু হয় যখন পর পর দুটো টেস্টে নেগেটিভ পাই।

আমি চুপ করে ওঁর কথা শুনি।

থার্ড টেস্টে নেগেটিভ পেলেই চমকে উঠি। অন্য হাসপাতালে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট সই করতে আনন্দ হয় কিন্তু এখানে চোখে জল এসে যায়।

সত্যি কি আন্‌ফরচুনেট ব্যাপার!

পুরুষরা তবু কোন ভাবে কোথাও না কোথাও কিছু কাজকর্ম করে জীবন কাটায় কিন্তু মেয়েদের যদি কেউ না নিয়ে যায় তারা কি ভাবে জীবন কাটাবে বল তো?

আমি ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে মাথা নাড়ি।

ডাঃ সাহানী হঠাৎ একটু হাসেন। বলেন, নাচনীকে যেদিন ছাড়ব সেদিন দেখ কি কাণ্ডটা হয়।

কিন্তু ও যে বলে ওর কর্তাবাবু ওকে মোটর করে নিয়ে যাবে?

ঘোড়ার ডিম নিয়ে যাবে। নাচনীর ধারণা ওর কর্তা ওর জন্য পাগল, কিন্তু সে কি ওর ভরসায় এতকাল বসে আছে? সে নিশ্চয়ই এতদিনে আর একটা মেয়ে নিয়ে ফূর্তি···

তাই বলে এই রকম ইয়াং স্ত্রীকে···

ডাঃ সাহানী একটু জোরেই হেসে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন, তুমি কি নাচনীর কর্তাকে ওর স্বামী ভেবেছ? ও একজন ড্যান্সার···

আমি ভাবতাম ও সব সময় হৈ-হৈ করে বেড়ায় বলেই ওকে সবাই নাচনী বলে। নট অ্যাট অল! ইউ ডোণ্ট নো হার স্টোরি?

না।

এরপর যেদিন ও তোমার চেম্বারে আসবে তখন জিজ্ঞাসা করো—

হ্যাঁ রে, তুই তো নাচতে জানিস না কিন্তু তোকে সবাই নাচনী বলে কেন রে?

নাচনী কোমরে হাত দিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, আমি নাচতে জানি না?

তুই কি ছোটবেলা থেকেই নাচ শিখেছিস যে তোর নাম নাচনী হল?

নাচনী আমার টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে মিটমিট করে হাসতে হাসতে বলল, তোমাদের হাসপাতালের খাতায় আমার কি নাম লেখা আছে তা দেখতে পারো না? আমার নাম কমলা।

কিন্তু তোকে যে…

আবার সেই এক কথা! এক কথা বার বার ঘ্যানর ঘ্যানর করতে তোমার বিরক্ত লাগে না? নাচনী টেবিলের একপাশ থেকে ওপাশে গিয়ে বলল, আমি নাচনী বলেই তো সবাই আমাকে নাচনী বলে ডাকে।

তার মানে?

তুমি তো দেখছি ডাক্তারী ছাড়া আর কিছুই জানো না। তাহলে শোন—

ওপাশে একটা টুলের ওপর বসে টেবিলের উপর দুই কনুই রেখে নাচনী শুরু করল, ন'বছর বয়সে খুব ধুমধাম করে লখনের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। আমার বিয়েতে আমার বাবা কত টাকা, কত জামাকাপড়, মণ্ডা-মিঠাই পেয়েছিলেন তা তুমি ভাবতে পারবে না।…

তোর বাবা টাকা পেলেন কেন?

কেন পাবেন না তাই বল? আমি তো আর ভেলা দাগী ছিলাম না?

ভেলা দাগী মানে?

তুমি কি জানো বল তো? আরে বাপু এক স্বামীর ঘর করে আসার পর তো আর আমার বিয়ে হচ্ছিল না। আমার মত হাঁড়ি ঠকঠকি মেয়ের বিয়ে দিলে সব বাপই টাকা পায়।

কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না, কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। বলি, তারপর কি হল তাই বল?

আমি তো বলতেই যাচ্ছি কিন্তু তুমিই তো এটা কি সেটা কি জিজ্ঞাসা করেই বিরক্ত করছ। নাচনী আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, তারপর বড় হবার পর আমি স্বামীর ঘর করতে গেলাম। তখন পথে-ঘাটে বেরুলেই গ্রামের পুরুষগুলো হাঁ করে চেয়ে থাকত। নাচনী মাথা দুলিয়ে বলল, কিন্তু আমি তো কাউকে ভয় পেতাম না। গ্রাম ছাড়িয়ে অযোধ্যা পাহাড় পর্যন্ত চলে যেতাম।

নাচনী হেসে বলল, একটা কথা বলব, তুমি বিশ্বাস করবে

ডাক্তারবাবু ?

কেন বিশ্বাস করব না ?

আমি যদি বড় রাস্তার ওদিকে যেতাম তাহলে সাইকেল-মোটর থামিয়েও কত বড়লোক আমাকে দেখত! হঠাৎ আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে নাচনী বলল, তারপর একদিন গঞ্জু আমাকে মোটর গাড়িতে তুলে নিল।···

আমি চমকে উঠি, সে কি রে ?

আবার সে কি রে! যা বলছি তাই শোন। ঐ গঞ্জু আমাকে তুলে না নিয়ে গেলে কি আমি নাচনী হতে পারতাম ? নাচনী একটু নড়ে-চড়ে বসে বলল, প্রথমে আমার খুব ভয় লেগেছিল। মোটরের মধ্যে চিৎকারও করেছিলাম কিন্তু যখন গঞ্জুর বাড়িতে গেলাম তখন আস্তে আস্তে আমার ভয় কেটে গেল।

প্রথমে ভেবেছিলাম আমাকে বোধ হয় মেরেই ফেলবে। কেষ্ট-পক্ষের শনিবার গঞ্জু আমাকে ধরেছিল তো, তাই অত ভয় করছিল, কিন্তু বাড়িতে পৌঁছবার পর গঞ্জু আমাকে কত দামী দামী শাড়ি, গন্ধ-তেল, সাবান—আরো কত কি দিল।

আমি কষ্ট করে হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করি, তারপর গঞ্জু কি করল ?

প্রায় সোনার মত চকচকে থালায় আমাকে কি দামী দামী খাবার দিল যা আমি বিয়ের সময়ও খাইনি। তারপর কি গদীওয়ালা মোটা বিছানায় ঘুমুলাম। আঃ! ঐ বিছানায় অতকাল শোবার পর আমি তো তোমাদের হাসপাতালে প্রথম প্রথম ঘুমুতেই পারতাম না।···

তোকে যে গঞ্জু নিয়ে গেল তা স্বামীর জন্য তোর মন খারাপ লাগত না ?

প্রথম প্রথম তু-একদিন লেগেছিল। তারপব কখনও কখনও মনে হত তবে বেশি না। ও তো আমাকে দামী শাড়ি, গন্ধ-তেল, সাবান কিছুই দিত না। পেট ভরে খেতেও দিত না। তারপর কোন কোন রাত্তিরে হাঁড়িয়া খেয়ে আমাকে কি দারুণ মারধোর করত!

ওকে আমার ভাল লাগবে কেন বল ?

যে কমলাকে রোজ সাতসকালে দূরের অযোধ্যা পাহাড় থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনতে হত, মাঠ-ঘাট ঘুরে শ্যাঁওয়া-কেঁদ-ভুড়রু যোগাড় করে এনে ক্ষিদের জ্বালা মেটাতে হত, সে কমলা গঞ্জুর কাছে এসে রাজরানী হল। পাকা বাড়ি। সেও ছোটখাটো একটা রাজবাড়ি। ঝি-চাকর। পরনে জরির শাড়ি, হাতে-গলায়-কানে চক্‌চকে সোনার গহনা। শ্যাঁওয়া ঘাস খেয়ে ক্ষিদের জ্বালাও মেটাতে হয় না। কমলা যেন রোজ রাজবাড়িতে নেমন্তন্ন খাচ্ছে। এখানেই শেষ নয়। ওস্তাদ রেখে কমলাকে নাচ-গান শেখাল গঞ্জু। কমলা নাচনী হল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজকর্ম শেষ করে গঞ্জু চলে আসত নাচনীর কাছে। চুলে গন্ধ-তেল মেখে, লাল ফিতে দিয়ে খোঁপা বেঁধে, রূপোর ঝুমকো কাঁটা গুঁজে, চোখে চওড়া কাজল, কানে কানপাশা, কপালে কাঁচপোকার টিপ, বাহুতে বাজু, হাতে গোছা গোছা চুড়ি, গলায় হার আর তারপর সামনে কুঁচি দিয়ে পরা পলাশ রঙের শাড়ি, সুন্দর রঙীন ব্লাউজ। এর পর জর্দা দেওয়া পান খেয়ে ঠোঁট লাল করত নাচনী আর দু'হাতে নিত আতর মাখানো দুটো রুমাল।

সানাই ঢোল আর ধামসা বেজে উঠলেই নাচনী শুরু করত নাচ গান—

প্রেম কি গাছে ফলে গো সখি!
প্রেম ফলিছে মানুষেরই গাছে গো,
প্রেম কি গাছে ফলে গো সখি!

ঢল ঢল ভঙ্গীতে নাচতে নাচতে নাচনী কখনও কখনও ঢলে পড়ত গঞ্জুর কোলে।

গঞ্জু ওকে আদর করত, ভালবাসত, নতুন বিছেহার পরিয়ে দিত ওর গলায়।

নাচনী উঠে দাঁড়ালেই সানাই বেজে উঠত, বেজে উঠত ঢোল আর ধামসা। আতর মাখানো রুমাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবার শুরু হত নাচ গান।

তুমি আমার ফুলাম তেল, তুমি আমার মনভোলা,
তুমি আমার আয়না চিরুনি গো,
ওগো সখি, তুমি আমার আয়না চিরুনি

জানো ডাক্তারবাবু, আমার স্বামী তো হাঁড়িয়া খেয়ে আমাকে মারধোর করত আর গঞ্জু আমাকে শুধু আদর করত। কত দিন সারা রাত ধরে আদর করেছে। নিজের বউয়ের কাছেও যেত না···

আমার হাসি পায়, দুঃখ হয়, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করি না। ওকে খুশি করার জন্য বলি, গঞ্জু সত্যি ভাল লোক ছিল।

ভাল মানে! একেবারে দেবতা। হবে না কেন বল? পেটে কত বিদ্যে, বাড়িতে কত টাকা। বাপ রে বাপ! তাছাড়া কত লোকে গঞ্জুকে খাতির করত। জানো ডাক্তারবাবু, বড় বড় দারোগা হাকিম পর্যন্ত ওর বন্ধু ছিল। নাচনী একগাল হাসি হেসে বলল, ওরাও আমার নাচ দেখতে আসত।

বলিস কি রে!

তবে কি? তোমাদের হাসপাতালে পড়ে আছি বলে কি ভেবেছ আমার কোন দাম নেই? নাচনী টেবিলে ভর দিয়ে আমার সামনে ঝুঁকে পড়ে মুখ নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলল, নাচনী রাখার মুরোদ ক'টা লোকের হয় বল ডাক্তারবাবু? তা ছাড়া—, মুখে হাসি, চোখে ব্যঙ্গ করে নাচনী বলল, নাচনী হবার মত রূপ-যৌবনের মুরোদই বা ক'টা মেয়ের থাকে বল?

এবার আর আমি হাসি চাপতে পারি না।

হাসছ? হাসো। আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাই, তারপর গঞ্জুর মোটর গাড়ি করে তোমাকে একদিন নিয়ে যাব। দেখো আমার নাচ···

সত্যি নিয়ে যাবি তো?

আমি কিরে করে বলছি তোমাকে নিয়ে যাব। আতর মাখানো রুমাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যখন তোমার সামনে নাচব তখন ঐ বড় দারোগা আর হাকিমদের মত তুমিও আমাকে জড়িয়ে ধরবে।···

আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। নাচনী স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। গ্রীষ্মের রুক্ষতার মুখোমুখি হয়েও ভাবছে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেই আবার বসন্তকাল ফিরে আসবে। কিন্তু তাই কি হবে? হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবার দিন যদি গঞ্জুর মোটর না আসে? যদি নাচনীর স্বপ্ন ভেঙে যায়? তাহলে? তাহলে কি হবে? ও কোথায় যাবে? কে ওকে আশ্রয় দেবে? ভালবাসবে? ওকে যদি একা একা রুক্ষ জীবনের মুখোমুখি হতে হয়? যদি কোন স্বার্থপর, হিংস্র মানুষের কাছে ওকে আত্মসমর্পণ করতে হয়?

না, না, তা যেন না হয়। আমি ভগবান বিশ্বাস করি কিনা জানি না, কিন্তু নাচনীর জন্য মনে মনে দু'হাত জোড় করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম। বললাম, এই সহজ, সরল, অনন্ত আকাশের মত প্রাণখোলা মেয়েটাকে দু'মুঠো অন্ন আর একটু আশ্রয় দিলে তোমার ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যাবে না। লক্ষ্মীটি ভগবান, এই হতভাগিনীর সুখটুকু কেড়ে নিয়ে তোমার বীরত্ব দেখাতে হবে না।

পানা-ভর্তি ঐ একটা দীঘি আর কোর্টের সামনে বাস স্ট্যাণ্ডের পাশে কয়েকটা চায়ের দোকান ছাড়া পুরুলিয়া শহরে আর কিছু নেই। মুন্সেফডাঙ্গা অলঙ্গীডাঙ্গা থেকে শুরু করে হুচুকপাড়া-আমলাপাড়া-জেলেপাড়া-নাপিতপাড়া—সবই প্রায় একরকম। ছোট্ট শহর যেমন হয় আর কি। সার্কিট হাউসে একজন ডেপুটি মিনিস্টার এলেই সারা শহরে মোটর গাড়ির ছুটাছুটি বেড়ে যায়। সার্কিট হাউসের সান্ত্রীদের বুটের আওয়াজ প্রায় আমার কোয়ার্টার পর্যন্ত ভেসে আসে। ক'বছর আগে পুরুলিয়া মেলার জন্য কয়েকদিন শহরে একটু উৎসবের গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল। নয়তো নিস্তারিণী কলেজের কিছু মেয়েকে নিয়েই মনে মনে বসন্তোৎসব। আর কিছু নেই। এমন কি গলা ফাটিয়ে কাউকে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলতেও শুনি না! এখানকার মানুষগুলোর বুকের খাঁচাটা বিরাট হলেও চিৎকার করার মত প্রাণশক্তি নেই। শ্যাওয়া ঘাস খেয়ে খিদের জ্বালা মিটালে আর

জীবনের সমস্ত ব্যর্থতার গ্লানি, নির্মম দারিদ্র্যের উপহাসকে ভোলার জন্য রাত্তিরে আকণ্ঠ হাঁড়িয়া খেয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে থাকলে কি কেউ চিৎকার করতে পারে?

মাঝে মাঝে মনেই হয় না এটাও বাঙলাদেশ। পশ্চিম বাঙলার একটা জেলা। সম্ভোগের সামগ্রী এখানে না থাকলেও সম্পদ তো কম নেই। মধ্য ইয়োরোপ, বলকান উপদ্বীপ, ভূমধ্য সাগরের আশপাশ থেকে আমরা আর্যরা এগুতে এগুতে একদিন হিন্দুকুশ টপকে ভারতবর্ষে এলাম। নিজেরাই নিজেদের ইতিহাস লিখলাম। ইতিহাসের পাতা ভরিয়ে দিলাম আর্য সভ্যতার কাহিনীতে কিন্তু আর্য সভ্যতার আগেও যারা ছিল? তারা কাব্যে উপেক্ষিতা উর্মিলার মত পড়ে রইল। পুরুলিয়া সেই কাব্যে উপেক্ষিতা উর্মিলাদেরই দেশ। তাই কি বিধাতা পুরুষ একদিনে মাইকেলকে টেনে এনেছিলেন এই পাষাণ-ময় দেশে? জানি না। কিন্তু মাইকেলের মত আমিও বলতে পারি—'কত মহানন্দ তুমি মোরে দিলে, হে পুরুণ্যে!'

পুরুলিয়ার চৌরঙ্গী—বাস স্ট্যাণ্ডের পাশের চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে ভাবতে কষ্ট হয় হরপ্পা-মহেনজোদাড়োর সমকালীন সভ্যতার লীলাভূমি ছিল এই পুরুলিয়া। সমগ্র জঙ্গল-মঙ্গল ইতিহাসের বইয়ে, ট্যুরিস্ট লিটচারোরে কলকাতার অন্যান্য দর্শনীয় জায়গার সঙ্গে সঙ্গে ক'বছর আগের তৈরি জৈন মন্দিরের কথা মোটা মোটা হরফে লেখা আছে, ছাপা হয়েছে তার ছবি, কিন্তু স্বার্থপর, বেইমান, তাঁবেদার ঐতিহাসিকরা স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের বলতে ভুলে গিয়েছেন ভগবান পার্শ্বনাথ তাঁর প্রেমের বাণী প্রথম ছড়িয়েছিলেন এই পুরুলিয়ার রাঢ় অঞ্চলের অরণ্য-পর্বতের মানুষদেরই মধ্যে। পুরুলিয়ার পূর্বপ্রান্তে কাঁসাই নদীর উত্তরের পার্শ্ব পাহাড়ের চূড়ার কাহিনী না জানলেও রাইটার্স বিল্ডিং-এর ট্যুরিস্ট অফিসারদের প্রমোশন আটকাবে না। যে ঐতিহাসিকরা চরিত্রহীন, লম্পট, অকর্মণ্য নবাব সিরাজ-দ্দৌল্লাকে দেশপ্রেমিক বানিয়েছেন, কুলত্যাগী লুৎফাকে মহীয়সী করেছেন, তাদের কাছে জঙ্গল-মঙ্গলের ইতিহাস, ঐতিহ্যের কি মূল্য?

শুধু ঐতিহাসিকদেরই বা দোষ দেব কেন ? ক্লাইভের কাছে পরাজয় বরণের পর নবাবের সৈন্যরা পালিয়ে যাবার পথে পরাজয়ের সমস্ত অপমান ও গ্লানি ভুলেও সারা রাত্রি যাত্রা-গান শুনেছিলেন। আমরা তো ওদেরই বংশধর !

হরিপদ সাহিত্য মন্দির থেকে দু-চারখানা বই এনে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে পড়তে পড়তে আমি অবাক হয়ে যাই। বিশ্বজিতের জন্য মনুমেন্টের নীচে অনেক মিটিং-এ গেছি। যেতে হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস শুনেছি, শুনেছি ধর্মের গোঁড়ামির জন্য সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনী, কিন্তু তারও প্রায় একশো বছর আগে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শৈশবে অন্যায় আর অবিচার, শোষণ আর লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে পুরুলিয়ায় যে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল, তার কথা কোনদিন কারুর মুখে শুনিনি। শুনিনি গোপাল মাঝির গৌরবময় কাহিনী।

পুরুলিয়া মানেই আদিবাসী নাচ আর ছৌ নৃত্য। শহরের নগরের উৎসবে পুরুলিয়ার আদিবাসী মেয়েরা নাচে আর লাটসাহেবের সামনে কোট-প্যান্টুলুন পরা ভদ্দরলোকগুলোর জোড়া জোড়া ক্ষুধার্ত-লোলুপ চোখ আদিবাসী মেয়েদের পুষ্ট ভরাট বুকে আঠার মত লেপ্টে থাকে। আর চিড়িয়াখানার বাঘ-ভাল্লুক দেখার মত ধানের শীষ, ময়ূরের পালক, কেয়ার গুচ্ছ সজ্জিত মানুষগুলোর ছৌ নাচ দেখে হাততালি দিই, কিন্তু খবর রাখি না ওদের দুঃখ-কষ্টের। মানুষ কত দুঃখ-কষ্ট পেলে অযোধ্যা পাহাড়ের ধারের স্বামীর সংসার ত্যাগ করে, গঞ্জুর নাচনী হয়েও গর্ব অনুভব করে, তা কি আমরা কোনদিন বুঝব না ?

রেভারেণ্ড ঘোষ একদিন লেপ্রসী হোমের সামনের মাঠে পায়চারি করতে করতে বললেন, দেখ অজয়, একশো বছর আগে একজন আইরিশ যুবক ওয়েলেসলী কসবি বেইলি আম্বালা শহরের কুষ্ঠরুগীদের দুঃখ, কষ্ট ও রোগযন্ত্রণা দেখে বড়ই দুঃখ পান। ডাবলিনে ফিরে গিয়েই বান্ধবী মিস চার্লট পিমের বাড়িতে এক ঘরোয়া বৈঠকে ভারতবর্ষের কুষ্ঠরুগীদের দুঃখের কাহিনী শোনাতেই ওরা একটা

পাবলিক মিটিংয়ের ব্যবস্থা করলেন আর ঐ মিটিংয়েই তিরিশ পাউণ্ড চাঁদা উঠল। রেভারেণ্ড ঘোষ একটু জোরেই একবার নিশ্বাস ফেলে বললেন, বেইলির বক্তৃতা ছাপিয়ে সার্কুলেট করতেই এক বছরের মধ্যেই আড়াইশো পাউণ্ড চাঁদা উঠল এবং সেই থেকেই আমাদের লেপ্রসী মিশনের জন্ম।

আমার দিক থেকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে রেভারেণ্ড ঘোষ লেপ্রসী হোমের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মিনিট। তারপর দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে দিলেন আশেপাশে চারদিকে। আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। আস্তে আস্তে আমার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বললেন, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের ঐ আইরিশ যুবকের কুষ্ঠরোগীদের জন্য যে দরদ ছিল তার একশো ভাগের এক ভাগ দরদও যদি আমাদের থাকত তাহলে এই হতভাগা মানুষগুলোকে শ্যাওয়া ঘাস খেয়ে বাঁচতে হত না আর কুষ্ঠরোগেও মরতে হত না।

আমি রেভারেণ্ড ঘোষের ঐ সামান্য আশাটুকুও পূর্ণ করতে পারব না। আমার সে মানসিক ঔদার্য বা ঐশ্বর্য নেই। কোথায় পাব? আমিও এই সমাজেরই দশজনের একজন। অতি সাধারণ একজন মানুষ। পেশায় ডাক্তার তবু কলকাতার রাস্তায় কুষ্ঠরুগী দুটো-একটা নয়া পয়সার জন্য কাছে এগিয়ে এলেই ছিটকে দূরে সরে গেছি। ইচ্ছা করলেও, মন চাইলেও ভয়ে, আতঙ্কে সামান্য দানও ওদের হাতে দিতে পারিনি। আমার নিজের যদি ঐটুকু ভালবাসা, দরদ না থাকে তাহলে অন্যের কাছে আশা করব কেমন করে?

একদিন ভারী মজা হল।

আমার সামনে বাড়ির এঞ্জিনিয়ার সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ থাকলেও ওর বাড়িতে আমার যাতায়াত নেই। ওঁকে মাঝে-সাঝে আমার কোয়ার্টারে আসতে বললেও উনি আসেননি। কারণটা ঠিক বুঝতে পারিনি। ভেবেছি হয়তো উনি বিশেষ মিশুকে নন—না না, তা কেমন করে হবে? ওঁর বাড়িতে তো অনেক বন্ধু-বান্ধব আসা-যাওয়া করেন। পরে ভেবেছি যে কোন কারণেই হোক উনি বোধহয়

আমাকে পছন্দ করেন না। অথবা বাড়িতে বিশ-বাইশ বছরের দুটি মেয়ে আছে বলে আমার মত ব্যাচেলারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা নিরাপদ মনে করেন না।

এঞ্জিনিয়ার সাহেবের ছেলে একটিই। প্রদীপ। দুটি মেয়ের পর ঐ একটি ছেলে। তাই বোধহয় ডাকনাম সোনা। সোনার বয়স বেশি নয়। সাত-আট। ভারী সুন্দর চেহারা। স্বভাবটি আরো ভাল। সোনার সঙ্গে আমার খুব ভাব। আমি হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে মহাদেবের হোটেলে খাওয়াদাওয়া করে ঘণ্টাখানেক ঘুমুতে না ঘুমুতেই সোনা স্কুল থেকে চলে আসে। কোনমতে দুটো খাওয়া-দাওয়া করেই ক্রিকেট ব্যাট আর একটা রবারের বল নিয়ে আমার কোয়ার্টারে চলে আসে। শুরু হয় আমাদের ক্রিকেট খেলা। খেলা মানে আমি রোজই বল করি, সোনা ব্যাট করে। এমন কি ফিল্ডিংটাও আমার জন্যে রেখে দেয়। বলে, জানো কাকু, তুমি তো একদম দৌড়াদৌড়ি কর না, ভালভাবে ফিল্ডিং দাও। শরীর ভাল হবে।

তুমি কি একটুও ফিল্ডিং করবে না?

আমি ফিল্ডিং দিয়ে কি করব? আমি তো স্কুলে অনেক দৌড়াদৌড়ি করি।

কোন-কোনদিন ক্যাচ-ক্যাচ খেলা হয়। কোনদিন আবার আমি গোলকিপার আর সোনা পর পর শতখানেক পেনাল্টি কিক্ মারে। ছোট্ট রবারের বল। প্রত্যেকটাই ফসকে যায়, আমি একটাও ধরতে পারি না। আমার পরাজয়ে ওর কি উল্লাস। ওর চিৎকার শুনে মনে হয় আই-এফ-এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলায় গোল দিয়েছে। আমার খারাপ লাগে না, বরং ভালই লাগে।

ব্যাট করতে করতে সোনা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, কাকু, ম্যাচ খেলবে?

কার সঙ্গে ম্যাচ খেলব?

আমি আর দিদি একদিকে, তুমি আর ছোড়দি অন্যদিকে।

মনে মনে বলি, তোমার বাবা যতদিন ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি, ততদিন তো এসব টেস্টে আমি চান্স পেতে পারি না। তাছাড়া তোমার ঐ ছুটি দিদির সামান্য সান্নিধ্যলাভের ক্ষীণ আশাতেই পি-ডবলিউ-ডি অফিসের একদল ছোকরা নিত্য তোমাদের বেগার খাটছে। তোমার দিদিদের সঙ্গে আমি ক্রিকেট খেললে তারা কি আর বেগার খাটতে উৎসাহ পাবে?

বললাম, তোমার দিদিরা কি ক্রিকেট খেলতে পারবে?

ব্যাটটাকে পাশে ফেলে দিয়ে ছুটো হাত কোমরে রেখে সোনা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি দিদিকে আউট করতে পারবে?

প্রথম বলেই স্টাম্প উড়ে যাবে। নিদারুণ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলাম।

পারবে? সোনা খুব গম্ভীর হয়ে আবার জানতে চাইল।

আবার আমি আগের মতই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, বলছি তো ফার্স্ট বলেই আউট করে দেব।

সোনা খপ করে আমার একটা হাত ধরেই বলল, দশ টাকা বাজি! তুমি দিদিকে আউট করবে, তাহলেই হয়েছে!

না না, সোনা, মেয়েদের সঙ্গে কি খেলব!

সোনা হেসে উঠল। বলল, তাহলে ভয় পেয়েছ বল?

মা আর মীনু যখন মাসখানেকের জন্য আমার এখানে এসেছিলেন তখন ওরা সোনাদের বাড়ি যেতেন। সোনার মা আর দিদিরাও আসতেন। সোনার ছুই দিদির সঙ্গেই মীনুর খুব ভাব হয়েছিল। ওরা ছুজনে মীনুকে নিয়ে সারা পুরুলিয়া শহর ঘুরে বেড়িয়েছে। কখনও কখনও এঞ্জিনীয়ার সাহেবের জীপে চড়েও ঘুরেছে। বলরামপুরের জৈন মন্দির, ছড়রার বৌদ্ধ-জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, অযোধ্যা পাহাড়। আমার সঙ্গে ওদের বিশেষ আলাপ নেই। হাসপাতাল যাতায়াতের পথে সোনাদের বাড়ির গেটের ধারে ওর মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে হাতজোড় করে নমস্কার করি। উনিও। কখনও কখনও সোনার ছুই দিদির সঙ্গেও দৃষ্টি বিনিময় হয় কিন্তু কথা

হয় না।

এরই মধ্যে সোনার জন্মদিন এল। সোনা সাতদিন আগে থেকে রোজ একবার করে মনে করিয়ে দিত, কাকু, বুধবার কিন্তু খেলা বন্ধ।

আমি জানি বুধবার ওর জন্মদিন। ও আমাকে নেমন্তন্ন করেছে। তবু জিজ্ঞাসা করি, কেন? বুধবারে তুমি বেড়াতে যাবে?

তোমার কি কিচ্ছু মনে থাকে না কাকু? কতবার বলেছি বুধবার আমার জন্মদিন। তুমি আসবে···

সরি। এবার মনে পড়েছে।

আমার সম্পর্কে ওর বাবার নির্লিপ্ততা, ঔদাসীন্যের জন্য আমার যাবার ইচ্ছা ছিল না। তাছাড়া সোনা ছাড়া আর কেউ আমাকে যেতে বলেননি, কিন্তু সোনার অনুরোধ উপেক্ষা করা মুশকিল বলে যেতেই হল।

আমি যেতেই সোনা ছুটে এল। আমি ওকে একটু আদর করে উপহারের প্যাকেটটা হাতে তুলে দিলাম। ঘর-ভর্তি লোক। মেয়ে-পুরুষ। সোনা আমার হাত ধরে এগুতেই লক্ষ্য করলাম ওর বাবার মুখের চেহারা বদলে গেল। তবু একবার শুকনো হাসি হেসে বললেন, আসুন।

একবার মনে হল চলে আসি। বসব না। আবার মনে হল, না, সেটা অভদ্রতা হবে। সোনা মনে মনে দুঃখ পাবে। আরো একটা কারণে চলে এলাম না। আমার সঙ্গে ওর বাবার বিচিত্র মনোভাবের কারণটা যদি জানতে পারি, সেই আশাতেই বসলাম। আমি বসতেই এঞ্জিনীয়ার সাহেব অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের বললেন, ইনি আমাদের লেপ্রসী হোমের ডাক্তার।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করলাম সবাইকে।—আমার নাম অজয় সরকার।

অন্যেরা কেউ নিজের পরিচয় না দিলেও সবাই হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন আমাকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এঞ্জিনীয়ার সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, এদের সঙ্গে মেলামেশা করতেও ভয় লাগে।

একজন ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

কোথায় কাজ করেন শুনলেন না? ঐ সর্বনাশা রোগের নাম শুনলেই তো রক্ত শুকিয়ে যায়।

এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে! তাহলে এই কারণেই উনি আমাকে দূরে দূরে রাখতে চান! অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেও বাইরে কিছু প্রকাশ করলাম না। বরং একটু হাসলাম।

আপনি হাসছেন? কিন্তু সত্যি বলছি আপনাদের দেখলে আমার ভয় করে। বিশেষ করে সোনাটাকে নিয়ে আমার সবচাইতে চিন্তা।

খুব সংযত দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকাতে গিয়েই দেখলাম বাবার কথাবার্তায় সোনার দিদির মুখে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠেছে।

অতি কষ্টে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বললাম, একটা কথা বলব এঞ্জিনীয়ার সাহেব? লেপ্রসী ছোঁয়াচে রোগ না। তাছাড়া বাতাসেও এ রোগের জীবাণু ছড়ায় না। এ রোগ যদি ছোঁয়াচে হত বা বাতাসে এর জীবাণু ছড়াত তাহলে এই পুরুলিয়া শহরে সবারই লেপ্রসী হত।

আমার বক্তব্যকে স্বীকৃতি জানিয়ে দু-একজন মাথা নাড়লেন। দু-একজন বললেন, তা তো বটেই। সোনার দিদি বললেন, বাবার আবার অহেতুক বেশী ভয়।

ঘরের আবহাওয়া একটু উল্টে যেতেই এঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন, আমার আর কি ভয়? ভয় হয় সোনাটাকে নিয়ে। যখন তখন যেখানে সেখানে···

বুঝলাম আমার সঙ্গে সোনার ঘনিষ্ঠতার জন্যই এই বক্রোক্তি। বললাম, অন্য জায়গার কথা বাদই দিলাম। আপনার বাড়ির পাশের এই লেপ্রসী হোম ১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন দিন কারুর কাছে শুনেছেন কি এই লেপ্রসী হোমের কোন ডাক্তার, নার্স বা অন্য কোন কর্মচারীর লেপ্রসী হয়েছে?

সোনার মা, দিদি ও আরো কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠলেন, ঠিক বলেছেন তো! আমি উঠে দাঁড়িয়ে এঞ্জিনিয়ার সাহেবের দিকে

তাকিয়ে বললাম, অশিক্ষিত গরীব লোকদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু আপনারা তো শিক্ষিত ভদ্রলোক। তারপর লেপ্রসী হাসপাতালের পাশেই থাকেন। একদিন একটু সময় করে ওখানে গিয়ে এই রোগটা সম্পর্কে কিছু জানতেও কি ইচ্ছা করে না?

সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে সবাইকে নমস্কার করে বললাম, চলি।

এঞ্জিনীয়ার সাহেব বললেন, সে কি?

সোনা বলল, না না কাকু, তুমি এখন যাবে না।

সোনার গাল টিপে আদর করে বললাম, কাজ আছে। আজ চলি। সামনের বছর তোমার জন্মদিনে অনেকক্ষণ থাকব।

সোনার মা এগিয়ে এসে বললেন, একটু বসুন। অন্তত একটু চা-টা…

আজ না। অন্য দিন হবে।

আর না। আমি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। বোধহয় শুধু সোনা ছাড়া আর সবাই বুঝলেন এঞ্জিনীয়ার সাহেবের জন্যই আমি চলে এলাম।

কোন কাজ ছিল না। কোয়ার্টারে ফিরে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। ভাল লাগছিল না। মনে হল সিস্টার ম্যাকলীন্স্-এর মত আমিও বন্ধুবান্ধবের অভাবে হাঁপিয়ে উঠেছি। ভেবেছিলাম সোনার জন্মদিন উপলক্ষে একটা সন্ধ্যা কিছু মানুষের সান্নিধ্যে আনন্দ করব কিন্তু হল না। শুধু কুষ্ঠরুগীরা নয়, কুষ্ঠ হাসপাতালের কর্মচারীদের প্রতিও সমাজের কি বিচিত্র অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অপমান! পুরুলিয়া আসার পর এই প্রথম নিঃসঙ্গতার জ্বালা অনুভব করলাম।

মহাদেব নেই। বাড়ি গেছে। প্রত্যেক মাসেই দু-তিন দিনের জন্য বাড়ি যায়। চাষবাস ঘর-সংসারের বিধিব্যবস্থা দেখাশুনা করে। তাছাড়া পুরুলিয়া থেকে অনেক দূরে ওর বাড়ি। সাঁতুড়ি থেকে পাঁচ মাইল হাটতে হয়। যাতায়াত করতেই প্রায় একটা দিন লেগে যায়। আগে আগে মহাদেব বাড়ি গেলে সিস্টার ম্যাকলীন্স্ বা ডাঃ সাহানীর

ওখানে খেতাম। দু-একবার দিদিও রান্না করে দিয়েছেন। এখন আমি নিজেই কিছু খাবার-দাবার খেয়ে নিই। তাছাড়া মা'র কাছ থেকে কিছু রান্নাবান্না শিখে নিয়েছি কিন্তু উনুন ধরাবার ঝামেলার জন্য রান্না করতে ইচ্ছা করে না। দুটো স্টোভই খারাপ হয়ে পড়ে আছে। মহাদেব কয়লার উনুনে রান্না করে বলে সারাবার গরজ বোধ করে না। ও থাকার সময় আমিও বলতে ভুলে যাই। ও বাড়ি চলে গেলেই স্টোভ দুটোর কথা আমার মনে পড়ে। আজ ভেবেছিলাম সোনার জন্মদিন উপলক্ষে কপালে কিছু জুটবে কিন্তু তাও হল না।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা বুঝতে পারিনি। হঠাৎ মনে হল কে যেন আমাকে ডাকছেন—

আপনি ঘুমুচ্ছেন ?

বাইরে তখন আলো থাকলেও বাড়ির মধ্যে বেশ অন্ধকার। দরজার ওপাশে, বসবার ঘরে একটা মেয়ের আবছা মূর্তি দেখতে পেলেও চিনতে পারলাম না। গলার স্বর অপরিচিত লাগল। শুয়ে শুয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, কে ? দিদি ?

না। আমি সোনার দিদি।

আমি একলাফে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনি !

মা পাঠিয়ে দিলেন···

আমি ওঁকে দেখে এতটা বিস্মিত হয়ে গেছি যে আলোটা জ্বালাতেও ভুলে গেছি। আমি আমার শোবার ঘরে বিছানার পাশেই দাঁড়িয়ে আছি আর উনি ঠিক দরজার ওপাশে, বসবার ঘরে দাঁড়িয়ে।

আপনার জন্য মা একটু খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এবার আমি হাসলাম। আস্তে আস্তে এগিয়ে বসবার ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিতেই দেখি ওঁর হাতে একথালা খাবার। লুচি, তরকারি। বাটি-প্লেটে আরও কত কি !

আপনার বাবা জানেন ?

বাবার উপর রাগ করেছেন বলে কি মা'র দেওয়া খাবারও খাবেন

না ?

কি বলব, একবার ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম।

খাবারের থালাটা হাতে নিয়েই উনি বললেন, কন্ট্রাক্টর খাটিয়ে খাটিয়ে বাবার কথাবার্তার ধরনই ঐ রকম হয়ে গেছে। আমাদের ভীষণ খারাপ লেগেছে। মা ভীষণ রেগে গিয়েছেন বাবার ওপর···

আপনি ?

সোনার দিদি একটু হাসলেন। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি আপনার জায়গায় হলে বাবাকে ঠিক কিছু বলে দিতাম। ঠিকাদার-কন্ট্রাক্টররা মুখ বুজে বাবার অপমান সহ্য করে বলে আপনিও করবেন কেন ?

শুনতে ভাল লাগলেও মুখে বললাম, ওসব বাদ দিন।

বলুন, খাবার কোথায় রাখব !

এনেছেন যখন তখন নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেব না, তবে না আনলেই ভাল করতেন। যে কোন কারণেই হোক আপনার বাবা যখন···

বাবার কথা বাদ দিন।

আপনি খাবার এনেছেন, একথা উনি জানতে পারলে····

এখন বাড়িতে আমি আর মা ছাড়া কেউ নেই।

কিন্তু এ রকম লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়ে কি আনন্দ পাব ? ওঁর চোখের ওপরে চোখ রেখেই জিজ্ঞাসা করলাম।

না খেলে বুঝব আমার আর মা'র উপরেও আপনি রাগ করেছেন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি কারুর উপরই রাগ করিনি।

সোনার দিদি ঘরের কোণের টেবিলে খাবারের থালাটা নামিয়ে রেখে বললেন, তাহলে তো খুব ভালো কথা। এখুনি গরম গরম খেয়ে নিন। আমি কাল এসে বাসনগুলো নিয়ে যাব।

উনি আর দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন। আমি ওঁর পিছন পিছন বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখি ওঁর মা আমার কোয়ার্টারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ঘরে এসে সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার টেনে খেতে বসলাম।

মনে মনে হাসি পেল। ভেবেছিলাম সারা রাত অভুক্ত থাকতে হবে কিন্তু অদৃষ্টে প্রায় বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন জুটে গেল। তাছাড়া—

ভাবতে গিয়েও একবার থমকে দাঁড়ালাম। সোনার দিদির সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলে বেশ লাগল। হাজার হোক সোনার দিদি দেখতে সুন্দরী। হঠাৎ যেন একবার বসন্তের দমকা হাওয়া বয়ে গেল।

হাসপাতালে বেশ পরিশ্রম করতে হয়। অন্যান্য জেনারেল হাসপাতালে কিছু কিছু সিরিয়াস পেসেন্টের জন্য ডাক্তারদের প্রতিটি মুহূর্ত উত্তেজনায় আর উৎকণ্ঠায় কাটাতে হয়। লেপ্রসী হাসপাতালে সে রকম কিছু হবার অবকাশ নেই ঠিকই, কিন্তু জেনারেল হাসপাতালে সাধারণ রুগীরা উপেক্ষিত হলেও আমাদের এখানে প্রত্যেকটি পেসেন্টকে প্রতিদিন দেখাশুনা করতেই হবে। ঘুরে ঘুরে এতগুলো পেসেন্টকে দেখা, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা সহজ ব্যাপার নয়। দুটো আড়াইটের সময় যখন হাসপাতাল থেকে ডিউটি সেরে কোয়ার্টারে রওনা হই তখন ক্লান্তি আর অবসাদে পা দুটো আর এগুতে চায় না। কতটুকুই বা পথ! প্রথমে একটু ঢালু, তারপর একটু উঁচু কিন্তু ঐটুকু চড়াই রাস্তা উঠতেই হাঁপিয়ে উঠি। তারপর কোনমতে কোয়ার্টারে পৌঁছে হাত-মুখে সাবান দিয়েই খেতে বসি। খাওয়া-দাওয়ার পর হাসপাতালের জামা-কাপড় ছেড়েই একটা পায়জামা-পাঞ্জাবি চড়িয়েই শুয়ে পড়ি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। বেশিক্ষণ ঘুমুতে পারি না। সোনা ব্যাট বল নিয়ে হাজির হয়। তবু ঐ ঘণ্টাখানেকের ঘুম না হলে আমি সন্ধ্যায় টলমল করি।

মহাদেব নেই বলে আজ হাসপাতাল থেকে এসে নিজেকেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তারপরই সোনার জন্য একটা উপহার কিনতে বাজারে ঘুরেছি অনেকক্ষণ। বাজার থেকে ফিরে এসে স্নান করেছি। একটু সাজগোজ করেছি। সোনাদের বাড়ি গেছি।

খাওয়া-দাওয়া করে ডাঃ ধর্মেন্দ্রর লেখা 'নোট্‌স অন লেপ্রসী' পড়তে পড়তে ইজিচেয়ারে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

দাদা, দাদা! আমার কাঁধে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে ডাক দিতেই জেগে উঠলাম।

কে? দিদি?

এখানে বসে বসেই ঘুমুচ্ছেন?

না না, ঠিক ঘুমুচ্ছিলাম না। হঠাৎ একটু ঝিমুনি—

দিদি হাসল। আমি কতক্ষণ এসেছি জানো?

কতক্ষণ?

আধঘণ্টা হয়ে গেছে।

সে কি! এতক্ষণ কি করছিলে?

তোমার খাওয়া-দাওয়ার বাসনপত্র পরিষ্কার করলাম, বিছানা ঠিক করলাম, ত্নটো ঘরেরই দরজা হাঁ করে খোলা ছিল ··

বললাম, তুমি কি এইসব করার জন্যই বাবা-মা'র কাছে গেলে না?

দিদি হাসল। বলল, কলকাতার বাড়িটা বড় ছোট। আমার জন্য একটা ঘর ছেড়ে দিতে সবারই কষ্ট হত। তাছাড়া কলকাতায় এত জানাশুনা লোক যে—

ভালই করেছ।

ভাল করেছি মানে?

বাড়ির এক ছেলে হবার জন্য সংসার-টংসারের ব্যাপারে আমি বড়ই দায়িত্বজ্ঞানহীন। তুমি এখানে না থাকলে আমার কি অবস্থা হত ভাবতে পারো?

আমার মত দিদিও জানে মহাদেব লোকটা ভাল। আমার সবকিছুই করে। ভাল ভাবেই করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানে যে সে যা করবে না তা দিদি করবে। তবু দিদি বলল, তুমি না থাকলে আমারই কি কম অসুবিধে হত।

কিন্তু দিদি, আমি তো তোমার কোন কাজ করি না।

তুমি আছ এটাই তো আমার কত বড় ভরসা! একটু থেমেই দিদি বলল, তুমি নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড। যাও, শুয়ে পড়।

না না, আমার ঘুম পাচ্ছে না। গল্প করতে বেশ লাগছে।

তাহলে শুয়ে শুয়ে গল্প কর। সঙ্গে সঙ্গেই দিদি আমার একটা হাত ধরে একটু টেনে বলল, নাও, চল।

উঠলাম। ও ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। একটা বেতের চেয়ার নিয়ে দিদি পাশে বসতে জিজ্ঞাসা করলাম, ক'টা বাজে বলতে পারো?

সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে।

তাহলে তুমি এবার যাও। ঘুমিয়ে পড়।

দিদি চাপা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, শুলেই কি ঘুম আসবে? শুলেই যত দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে ভিড় করে। তার চাইতে তোমার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বললে মনটা হাল্‌কা লাগে।

তুমি রোজ রাত্রে এসে গল্পগুজব কর বলে আমারও এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে তোমার সঙ্গে বকবক না করলে ঘুমই আসে না।

দিদি একটু হাসল। বলল, মহাদেব রোজ রাত্রে শালার বাড়িতে যাবার সময় আমাকে কি বলে জানো?

কি?

বলে, দিদি, চললাম। তোমার দাদার বাড়ি সামলিও।

আমি হাসি। বলি, আচ্ছা দিদি, তুমি কোথাও বেড়াতে যাও না, তাই না?

এই তো তোমার এখানে বেড়াতে আসি।

এটা কি বেড়ানো হল?

এই যথেষ্ট। আর কিছু চাই না।

মনে মনে বললাম, তোমার মত হতভাগিনী আর কি পারে! চাওয়া-পাওয়ার দিন তো তোমার শেষ হয়েছে!

দিন কয়েক পরের কথা। সেদিন আমার অফ্‌ ডে। মহাদেব খুব খাইয়েছে। ছুটির দিন দুপুরে আমি ঘুমোই না। বই পড়ি। পিঠে দুটো বালিশ দিয়ে খাটের উপর বসে বসে বিপ্রদাস পড়ছি। দিদি এল। বই বন্ধ করে গল্প করতে শুরু করলাম। হাসতে হাসতে

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বুঝি কাজ শেষ হলেই একবার আমার এখানে না এলে শান্তি পাও না ?

দিদিও হাসল। বলল, তুমি এখানে না এলে আমিও এখানে থাকতাম না।

কেন ?

আর এখানে থাকতে ভাল লাগছিল না। কোন জায়গাতেই বেশী দিন থাকতে ভাল লাগে না। আর এখন তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতেই ইচ্ছা করে না।

তোমার সঙ্গে দেখা না হলে হয়তো আমিও পুরুলিয়ায় আসতাম না।

তোমাকে দেখেই আমার মন বলেছিল তুমি এখানে আসবেই।

আমি হাসি।

হাসছ! তোমাকে ছুঁয়ে বলছি···

আমি দিদির মাথাটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিতেই দিদি বলল, আচ্ছা দাদা, তুমি আমাকে খুব ভালবাস, তাই না ?

মুখে কিছু বললাম না। হাসি হাসি মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম, না।

মিথ্যে কথা বলো না। তুমি আমাকে খুব ভালবাস। আমি যা চাইব তুমি আমাকে তাই দেবে!···

আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, আচ্ছা দিদি, এতদিন তোমাকে আমি কিছুই দিইনি, তাই না ? কি চাও বল ?

দিদি হাসতে হাসতে বলল, কি আবার চাইব ?

তোমার তো কিছু দরকারও হতে পারে···

সে সব তো বাবা মা-ই পাঠিয়ে দেন। সত্যি বলছি দাদা, আমার যা প্রয়োজন তার চাইতে বেশী জিনিস-ই বাবা-মা দেন।

কিন্তু তোমাকে কিছু দিতে পারলে আমারও তো ভাল লাগত।

দিদি আবার হাসে। বলে, আমার বাক্সে কত শাড়ি ব্লাউজ আছে জানো ?

ওসব আমি জানতে চাই না।

আমার কাছে কত টাকা জমেছে জানো ? প্রায় দু'হাজার···

বলছি তো, ওসব আমি জানতে চাই না। ওসব বাদ দিয়েও কিছু পেতে তো তোমার মন চায়।

হঠাৎ দিদির মুখের হাসির রেখাগুলো মিলিয়ে গেল। বিষণ্ণতার অন্ধকারে ডুবে গেল ঐ সুন্দর মুখখানা। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতেই দিদির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। তারপরই ফেটে পড়ল, যা চাই তা তো তোমাকে বলতে পারব না দাদা !

আমি সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা তুলে ধরেই বললাম, দিদি !

দিদি কাঁদতে কাঁদতে দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার বুকের উপর মুখখানা রাখল।

॥ পাঁচ ॥

দিনে দিনে কত কি জানলাম, কত কি দেখলাম। আগে আগে রুগী এলেই স্লিট অ্যাণ্ড স্ক্যাপ মেথডে চামড়া নিয়ে মাইক্রোস্কোপের অয়েল ইমার্সেন লেন্সের নিচে জিলনিলসেন টেস্টে লম্বা লম্বা লাল রডগুলো না দেখা পর্যন্ত প্রেসক্রিপসন লিখতে ভয় পেতাম। এখন ? আউটডোরে রুগী দেখার সঙ্গে সঙ্গে লিখি, ডিফিউজড্ ইনফেলট্রেশন অল ওভার দ্য বডি। ক্লয়িং অফ রাইট হ্যাণ্ড।

তারপর রুগীর হিস্ট্রী আর এগজামিনেশনের খুঁটিনাটি লিখতে লিখতেই একবার রুগীর দিকে তাকিয়ে বলি, শিক্ষিত লোক হয়েও এত দেরি করে এলেন কেন ?

আমার প্রশ্নের কোন জবাব পাই না। বোধহয় প্রত্যাশাও করি না। ট্রিটমেণ্ট ও ডোজের নীচে লিখি, ডি-ডি-এস টোয়েন্টি ফাইভ এম-জি-এস।

আগে ডি-ডি-এস-এর ডোজ লিখতে ভয় পেতাম। এই রোগের

এই একটিই ওষুধ, কিন্তু চিকিৎসার শুরুতেই বেশি ডোজ দিলে অনেক সময় খুব খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়। আউটডোরে নিত্য এই ধরনের রুগী দেখছি। বিশেষ করে শিক্ষিত রুগীদের মধ্যে। এদের পকেটে পয়সা থাকে। লুকিয়ে-চুরিয়ে পাড়া-বেপাড়ার ডাক্তারকে দেখিয়ে চট করে রোগমুক্ত হতে চান এবং ডাক্তারবাবুও নিজের কৃতিত্ব দেখাবার জন্য হেভী ডোজে ডি-ডি-এস দেন। ম্যাজিকের মত রোগ কমতে শুরু করে। ডাক্তার আর রুগী দুজনেই খুশি কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সর্বনাশা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়।

কয়েক মাস আগেকার কথা। সেদিন সকালে আমার আউটডোর ডিউটি। রুগী দেখা শেষ। এক কাপ চা খাবার জন্য হাত ধুয়ে এসে সামনের বারান্দায় বসতেই ঘোমটা-টানা একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। বলল, ডাক্তারবাবু, আমাকে একটু দেখবেন ?

ডানদিকের ঘর দেখিয়ে বললাম, ওখানে গিয়ে আগে নার্সকে দেখিয়ে আসুন।

নার্সকে দেখাব না, আপনিই চলুন।

মেয়ে পেসেন্টদের আগে নার্সই দেখেন। তারপর···

না না, আমি নার্সকে দেখাব না।

আশ্চর্য ব্যাপার ! জামা-কাপড়ে ঢাকা শরীরের নানা জায়গায় এ রোগ হয়। সেজন্য সব মেয়ে পেসেন্টকেই আগে নার্স দেখেন। পরে আমরা হাত-মুখ-পা দেখি। অনেক মেয়ে পেসেন্ট হাত-মুখ-পা দেখাতেও দ্বিধা করেন কিন্তু এ মেয়েটি নার্সকে দেখাবে না কেন ? বললাম, পুরুষমানুষ হয়ে আমি তো সব জায়গা দেখতে পারব না, তাই বলছি নার্সকেই আগে···

কাকুতি-মিনতি করে মেয়েটি বলল, না না, ডাক্তার বাবু, আমি কিছুতেই নার্সকে দেখাব না। আপনিই · কাইগুলি···

ঘোমটা দিয়ে থাকলেও বুঝলাম মেয়েটি শিক্ষিতা। বললাম, আগে নার্সকে দেখানোই এখানকার নিয়ম।

আমি যখন বলছি তখন আপনি কেন দ্বিধা করছেন ডাক্তারবাবু ?

আমি কিছুতেই নার্সকে দেখাব না।

অনেক করে বুঝিয়েও কোন ফল হল না। বাধ্য হয়েই ওকে নিয়ে ভিতরে গেলাম। উনি ঘোমটা খুলতেই বুঝলাম ওঁর বয়স বেশি নয়। বোধহয় তেইশ-চব্বিশ। সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন নেই। মনে হল অবিবাহিতা। তারপর ওঁর নগ্ন শরীরের উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়েই চমকে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, মনে হচ্ছে ওষুধের রি-অ্যাকশানে এরকম হয়েছে। আপনি কি কোন ডাক্তারকে দেখিয়েছেন?

একজন ডাক্তারকে দেখিয়েই তো এই সর্বনাশ।

মেয়েটি মেদিনীপুরে চাকরি করে। বাড়ি ডায়মণ্ডহারবার। বিয়ের কথাবার্তা শুরু হবার পর ঠিক করল চটপট রোগমুক্ত হতে হবে। তা নয়তো স্বামীর ঘর করবে কি ভাবে। খুব গোপনে একজন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা শুরু হল। হেভী ডোজে ডি-ডি-এস পড়ার কিছুদিনের মধ্যেই বেশ উন্নতি হল কিন্তু প্রতিক্রিয়া শুরু হতে দেরি হল না।

আগে এ ধরনের রুগী দেখলে ঘাবড়ে যেতাম। এখন নির্বিবাদে সব রকমের রুগী দেখছি, চিকিৎসা করছি। দিনে দিনে মানুষ কি আশ্চর্য ভাবে পাল্টে যায়, তাই ভাবি! আমিও কত পাল্টে গেছি! আগে বাড়ি ছেড়ে নড়তে চাইতাম না আর এখন ছুটি নিয়ে বাড়ি যেতেও চিন্তা হয়। গত মাসেই প্রথম ছুটি নিলাম। এক সপ্তাহ এখানে ছিলাম না। ফিরে আসার পর নাচনী বলল, তুমি কলকাতা গিয়েছিলে ডাক্তারবাবু?

হ্যাঁ।

চোখ দুটো বড় বড় করে জিজ্ঞাসা করল, এই এতদিন কলকাতায় ছিলে?

আমি হাসি। বলি, এতদিন কোথায়? মাত্র সাত দিনের জন্য তো গিয়েছিলাম।

তুমি মিছে কথা বলছ ডাক্তারবাবু। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল,

এতদিনে কখনও সাতদিন হয় ?

ওর কথায় আমার আরো হাসি পায়। বলি, আমার কথা বিশ্বাস না হলেও বড় ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিস।

এবার নাচনী বলে, কলকাতায় কি আছে যে এতদিন ওখানে কাটালে ?

কলকাতাতেই তো আমার সবাই আছেন। বাবা, মা, বোন···

বউ ?

মুখে নয় শুধু, মাথা নেড়েও বললাম, না।

ও যেন আকাশ থেকে পড়ল, তোমার বউ নেই ?

না।

মরে গেছে ?

না, বিয়েই করিনি। কে আমাকে বিয়ে করবে বল্ ?

আরো অনেকক্ষণ বকবক করার পর নাচনী বলল, তুমি না থাকলে হাসপাতালটা ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

সে কি রে ?

সত্যি বলছি ডাক্তারবাবু, তোমার কাছে বকুনি না খেলে যেন দিনই ফুরোতে চায় না।

আমি হাসি কিন্তু মনে মনে অবাক হই। এরা এত কাছের মানুষ হয়ে গেছে !

মিত্তিরদা বললেন, এরপর কলকাতা যাবার আগে জানাবেন তো। যদি এর মধ্যে মণিকার চিঠি আসত···

আমি মিত্তিরদার পায়ের আঙুলগুলো একটু টেনে টেনে দেখতে দেখতে বললাম, দেখবেন আজকের ডাকেই আপনার চিঠি আসবে।

ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকতেই দুর্গা জিজ্ঞাসা করল, এতদিন যে এখানে ছিলে না, কাকে মা বলে ডাকতে ?

দুর্গাকে একটু আদর করে বললাম, যাকে-তাকে কি মা বলে ডাকা যায় ? মনে মনে তোমাকেই মা বলে ডাকতাম।

কলকাতা থেকে ফিরে আসার দিন সন্ধ্যায় আমার কোয়ার্টারে

ডাঃ সাহানী আর সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ এসেছিলেন। ওঁরা যখন গেলেন তখন নটা বেজে গেছে। ওঁরা চলে যাবার পর মহাদেব খেতে দিল। খেতে খেতেই ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁ রে মহাদেব, আজ সারা-দিনে দিদির সঙ্গে তো দেখা হল না?

দিদি তো রাঁচী গিয়েছেন।

সে কি রে?

কলকাতা থেকে ওঁর বাবা-মা এসেছিলেন। ওদের সঙ্গেই দিদি রাঁচী গিয়েছেন।

কবে ফিরবে?

দু-চার দিনের মধ্যেই ফিরবেন।

তাহলে সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্-এর খাওয়া-দাওয়ার···

কথাটা শেষ করার আগেই মহাদেব বলল, আমিই করছি। তবে দু-একদিন রাত্রে উনি বড় ডাক্তার সাহেবের বাড়িতেও খেতে যান।

দিদির অবর্তমানে মহাদেব যে সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্-এর দেখাশুনা করছে জেনে খুব খুশি হলাম। বললাম, এতদিন পর তুই একটা কাজের কাজ করছিস।

মহাদেব হাসতে হাসতে বলল, আপনার তো ধারণা আমি কাজ করতে চাই না কিন্তু কাজে ভয় পাবার লোক আমি না।

তা তো বটেই। কাজে ভয় পাস না বলেই তো দিদির ঘাড়ে সব কিছু চাপিয়ে দিয়ে শালার বাড়ি পালিয়ে যাস।

আমি উঠলাম। মহাদেব আর কথা না বলে হাসতে হাসতে আমার খাবার থালা-বাটি নিয়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেল।

হাত-মুখ ধুয়ে সামনের বারান্দায় দাঁড়াতেই সামনের এঞ্জিনীয়ার সাহেবের বাড়িতে চোখ পড়ল। ভাবলাম একবার ঘুরে আসি। আবার ভাবলাম, না, থাক। সোনার জন্মদিনের কয়েকদিন পর থেকে এঞ্জিনীয়ার সাহেব আমার প্রতি সদয় হয়েছেন। বোধহয় স্ত্রী ও মেয়ের জন্যই ওঁর এই পরিবর্তন। এখন প্রায় রোজই ও বাড়ির কেউ না কেউ আমার কোয়ার্টারে আসেন। আমিও যাই। তবে সোনার মা আর

দিদি ইলার সঙ্গেই আমার বেশি ভাব। এখন সোনার স্কুল ছুটি হয় দেরিতে। ওর ছোড়দি ইরা কলেজে যায়। এঞ্জিনীয়ার সাহেবের অফিস ছাড়াও ঘোরাঘুরি আছেই। দুপুরের পর, বিকেলের আগে সোনার মা আর ইলার সঙ্গে প্রায় রোজই আমি গল্পগুজব করি। কখনও ওদের বাড়িতে, কখনও আমার কোয়ার্টারে। পুরুলিয়ায় থাকলে এঞ্জিনীয়ার সাহেবও ভোরবেলায় মর্নিংওয়াক করে ফেরার পথে অথবা রাত্রের দিকে আমার কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দেন, ডাক্তার ঘুমুচ্ছ নাকি ? আমি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসি। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমরা কথা বলি।

সোনার মা খুব মিশুকে। এ পাড়ার সবার সঙ্গে ওর ভাব। সব সময় হাসি-খুশি। এঞ্জিনীয়ার সাহেব নিঃসন্দেহে ঘুষ খান কিন্তু প্রতিদিন কিছু না কিছু খাবার তৈরী করে আমার মত দশজন প্রতিবেশীকে বিলিয়ে সোনার মা তার সদ্ব্যবহার করে। ওঁকে অনেকটা ছোট মাসী, ছোট কাকিমা মনে হয়। শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বও করা যায়। ইলাও ঠিক ওর মায়ের মতন। দিদি আর সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্‌-এর সঙ্গে ওর খুব ভাব। ইলা দিনের মধ্যে কতবার যে ও বাড়ি যায় তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ইদানীং ও বাড়ি যাতায়াতের পথে একবার আমার এখানেও দু'চার মিনিট কাটিয়ে যায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, নিশ্চয়ই মাকে চিঠি লিখছেন ?

তাকিয়ে দেখি ইলা। বললাম, না, বিজুকে লিখছি।

বিজু ছাড়া কি আপনার আর কোন বন্ধু নেই ?

আমি হাসি। বলি, কেন ?

আপনার মত ঘরকুনো লোকের সঙ্গে কি কারুর বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব ?

আবার আমি হাসি। বলি, আমি ঘরকুনো ?

ইলাও হাসে। বলে, ভাগ্যিস আপনার বিয়ে হয়নি! হলে সবাই বলত স্ত্রৈণ।

অন্যেরা রাগ করলেও বউ নিশ্চয়ই খুশি হবে।

মোটেও না।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তোমার কপালে যদি আমার মত স্বামী জোটে ?

ভেবে দেখব।

একদিন স্যুট-টাই পরে বাইরের ঘরে বসে আছি। দিদির সঙ্গে ইলা ঘরে ঢুকেই বলল, চেহারাটা তো দারুণ হ্যাণ্ডসাম স্মার্ট! স্বভাবটা একটু স্মার্ট করুন তো ?

দিদি হাসে, আমিও হাসি।

কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে এসব কথা মনে পড়ল। তারপর ভিতরে এলাম। যথারীতি পিঠে দুটো বালিশ দিয়ে একখানা উপন্যাস নিয়ে বসলাম।

তাহলে কলকাতা থেকে ফিরেছেন ?

তাকিয়ে দেখি ইলা আর সোনা। বললাম, ভিতরে এসো।

সোনা আমার কাছে এগিয়ে এল। ইলা দরজার ওখানে দাঁড়িয়েই বলল, সেই সকালে এসেছেন অথচ সারা দিনে একবারও দেখা করলেন না। আপনাকে কি আমি সাধে ঘরকুনো বলি ? চলুন, মা ডাকছেন।

কেন ?

ইলা কিছু বলার আগেই সোনা বলল, পায়েস খেতে।

ইলার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি পায়েস খেতে ডাকছেন ?

কোন কিছুর লোভ না দেখালে তো আপনাকে ঘর থেকে বের করা যাবে না।

আমি যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আচ্ছা, তুমি যে এভাবে কথা বল, আমি যদি রাগ করি ?

ইলা মাথা নেড়ে চোখের ইশারায় জানাল, না, আমি রাগ করব না।

ও বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই ইলা বলল, জানো মা, এই সাড়ে ন'টার মধ্যেই উনি খাওয়া-দাওয়া করে বিছানায় উঠেছিলেন।

বললাম, ন'টার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া না করলে কি এখন পায়েস খেতে পারতাম ?

খুব বেশী লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার ক্ষমতা বা অভ্যাস আমার নেই, কিন্তু তবুও পুরুলিয়ায় আসার পর আস্তে আস্তে বহুজনের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে না দিয়ে পারলাম না। কখনও কখনও আমাদের ভাটবাঁধ পাড়া ছাড়িয়ে রেল লাইন পার হয়ে চলে যাই বলরামপুর। মাইল তিন-চার পথ। কাঁচা-পাকা রাস্তা। রিকশা চলে কিন্তু হেঁটেই যাই। তারপর রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামি। কিছুদূর গেলেই গ্রামের ঘরবাড়ি। দু'চারটে বাড়ি পেরুতে না পেরুতেই পশুপতির সঙ্গে দেখা হবেই। আমি যেমন ঘর ছেড়ে বেরুতে পারি না, তেমন পশুপতি আবার ঘরের মধ্যে বন্দী থাকতে পারে না। নতুন বউয়ের সঙ্গে গল্প করার চাইতে জঙ্গল মহলের পুরনো ইতিহাস ঘাঁটা-ঘাঁটিই ওর বেশী ভাল লাগে। ওর কাছে সেসব ইতিহাস শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। কখনও পশুপতি গান শোনায়—

বারে বারে বারণ করি ডাবরে
ঘর জুড়ো না
উয়ারা জানে নাই গো, শুনে নাই গো
কুটুমের মান জানে নাই।

পশুপতি হেলে দুলে এমন সুন্দর করে গান শোনায় যে আমি সব কথার অর্থ না বুঝলেও বিভোর হয়ে থাকি।

কোন কোনদিন পশুপতির সঙ্গেই একটু দূরের নব কুষ্ঠনিবাস দেখতে যাই কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারি না। লজ্জায়, দুঃখে মাথা হেঁট হয়ে আসে। শুধু এখানকার পেসেন্টদের শরীরে নয়, প্রতিষ্ঠানটির সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ। পরিচালকদের হৃদয়হীন উপেক্ষা দেখতেও কষ্ট হয়। চোখ জ্বালা করে। বলরামপুর ছেড়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসি পুরুলিয়া।

দিদি তখনও ফেরেনি। ইলাই কৈফিয়ত তলব করল, আজ হাসপাতাল থেকে এসে খাওয়া-দাওয়া করেই কোথায় গিয়েছিলেন ?

বলরামপুর।

বলরামপুর! ইলা অবাক হয়ে বলে, সে তো শহর ছাড়িয়ে অনেক দূর। কিন্তু জানালা দিয়ে যে দেখলাম আপনি হেঁটে হেঁটে ফিরছেন!

হ্যাঁ, হেঁটেই গিয়েছিলাম, ফিরেও এলাম হেঁটে।

ইলা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এবার একটা মোড়া টেনে বসল। হাসতে হাসতে বলল, আচ্ছা, আপনি এত কৃপণ কেন বলুন তো? পান খান না, সিগারেট খান না, সিনেমা দেখেন না···

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, একলা একলা সিনেমা দেখতে কি ভাল লাগে?

একলা ভাল না লাগলে দু-একজনকে সঙ্গে নিতে কে বারণ করেছে?

সেই দু-একজনই বা পাই কোথায়?

কোনদিন কাউকে বলেছেন? আমার দিকে তাকিয়ে একটু উপহাসের হাসি হেসে ইলা বলল, আসলে আপনি এক নম্বরের কিপটে! যে লোক দু-তিন টাকা রিক্শা ভাড়া বাঁচাবার জন্য পাঁচ-সাত মাইল হাঁটতে পারে, সে আবার অন্য কাউকে সিনেমা দেখাবে!

ইলা আসে পাঁচ-দশ-পনেরো মিনিটের জন্য। তার বেশি নয়। সঙ্গে মা থাকলে বেশি সময় থাকে। ঐ পাঁচ-দশ মিনিটই আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে, কিন্তু ঝগড়ার মধ্যেও কি যেন একটা মিষ্টি সুর শুনতে পাই মনে মনে। সে সুর, গান, মনের সে কথা স্পষ্ট করে ও আমাকে শোনাতে চায় না, আমিও শুনতে চাই না। তবু গোধূলির মত অস্পষ্ট সূর্যের আলোয় সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যায়। অনুভব করা যায়। মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছা করে কিন্তু প্রকাশ করার সাহস হয় না। আমি কিছু বলতে পারি না বলে কি ইলাও কোনদিন কিছু বলবে না? নাকি যেটুকু বলে, সেটুকুই সব? আর কি কিছুই ওর বলার নেই?

ইলা চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে শূন্যতার স্বাদ পেলাম। দিদিও নেই। সিস্টার ম্যাকলীন্স্ আজ মোবাইল ইউনিটের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন। বোধহয় এখনও ফেরেননি। ফিরলেও ক্লান্ত। নিশ্চয়ই বিশ্রাম করছেন। মহাদেব ছুটি বাড়ির কাজ সামলাতে

ব্যস্ত। সূর্য অনেকক্ষণ অস্ত গেছে। এখন বেশ অন্ধকার। চারপাশের ঘরবাড়িতে আলো জ্বলছে। আমি আমার এই ঘরে বসে বসেই দেখছি সোনাদের বাড়িও আলোয় ভরে গেছে। মাঝে মাঝে ওর মা-বাবা আর দিদিদের ঘোরাঘুরি করতে দেখছি। কখনও কখনও আকাশ-পাতাল ভাবছি। ভাবছি নিজের কথা, মা-বাবা-মীনুর কথা, বিজুর কথা, লক্ষ্ণৌ থেকে ফেরার ইতিহাস, ভাবছি আমাদের হাসপাতালের পেসেণ্টদের কথা···

আমার কাঁধের উপর কার হাতের ছোঁয়া লাগতেই চমকে উঠলাম, কে ?

আমি সিস্টার ম্যাকলীন্স্।

আমি তাড়াতাড়ি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠতে গেলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উনি আমার কাঁধের উপর হাত রেখেই একটু চাপ দিয়ে বললেন, বসুন।

আপনি বসুন।

ব্যস্ত হবেন না।

কয়েকটা মুহূর্তের নীরবতার পর সিস্টার ম্যাকলীন্স্ বললেন, এখানে একলা থাকার এই হচ্ছে বিপদ। মাঝে মাঝে মনে হয় পথের শেষে পৌঁছে গেছি।

আমি শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি।

দিদি নেই বলে আপনার মনটা আরো বেশি খারাপ হয়ে গেছে, তাই না ?

আমি একটু হাসি। মুখে কিছু বলি না।

দিদি আপনাকে সত্যি খুব ভালবাসে। প্রায় এক নিঃশ্বাসেই সিস্টার ম্যাকলীন্স্ বললেন, অফ কোর্স আপনিও দিদিকে খুব ভালবাসেন।

আমি তখনও ইজিচেয়ারে বসে। সিস্টার ম্যাকলীন্স্ নিজেই ঘরের আলো জ্বাললেন। মুখে তৃপ্তির হাসি মাখিয়ে বললেন, আমার ওখানে চলুন। দুজনে একসঙ্গে চা খাব।

কোন কথা না বলে আমি ওঁকে অনুসরণ করলাম।

চা খেতে খেতে সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ বললেন, খুব বেশি দিন এখানে থাকবেন না। এখানে বেশিদিন থাকলে এত মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়তে হয় যে পরে আর বেরুবার রাস্তা থাকে না।

ঠিক বলেছেন।

আমাদের মত আপনারা তো সারা জীবন একলা একলা কাটাবেন না। তাহলে আপনারা কেন এত জড়িয়ে পড়বেন?

আমি চুপ করে থাকি। বলতে পারি না, হঁ্যা, আপনার মত আমিও তো একলা একলা কাটিয়ে দিতে পারি সারা জীবন।

সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, আমিই তো ডাঃ রায়কে এখান থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিই।

কেন?

যে কারণে আপনাকে চলে যেতে বলছি ঐ একই কারণে···

কিন্তু ডাঃ সাহানী তো···

ওর কথা আলাদা। সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্ বললেন, মিসেস সাহানী আপনাদের মত বাঙালী ঘরের বউ ছিলেন। তারপর ওর লেপ্রসী হয় এবং সেরেও যায়। কিন্তু ভাল হয়ে গেলেও স্বামী ওঁকে ফিরিয়ে দিলেন।···

আমি অবাক হয়ে বললাম, তাই নাকি?

হঁ্যা। তারপর উনি বি. এ. পাস করে চাকরি নিলেন কিন্তু আপনাদের দেশে একজন ইয়াং মেয়ের একলা থাকা অসম্ভব। আজে-বাজে লোকজনের উৎপাতে উনি পাগল হয়ে উঠেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ডাঃ সাহানী ওঁকে বিয়ে করলেন।

আমি বললাম, বাট সী ইজ এ নাইস লেডী।

অফ কোর্স! ইন ফ্যাক্ট ডাঃ সাহানী তো বলেন, হি ইজ ভেরী ফরচুনেট যে উনি অমন স্ত্রী পেয়েছেন।

মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, ডাঃ সাহানীর মত আমি কি

পারব অমন কোন অভাগিনীকে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে? সমস্ত সম্ভাব্য ঐশ্বর্য আর মর্যাদায় ভরিয়ে দিতে?

* * *

মা মাঝে মাঝে আমার বিয়ের কথা বলেন। আমি বলি, আমি যখন তোমাদের একমাত্র ছেলে তখন বিয়ে তো আমাকে করতেই হবে।

মা বলেন, কিন্তু তোর পছন্দ-অপছন্দ···

আমি হাসতে হাসতে মা'র গলা জড়িয়ে ধরে বলি, আমার পছন্দ-অপছন্দর কথা না জেনেই যখন ভগবান তোমার মত মা দিয়েছেন,তখন বউ পছন্দ করার ঝামেলাটা না হয় তুমিই নিলে। বউ তুমিই পছন্দ কর আর আমিই পছন্দ করি, শেষকালে আমি তো স্ত্রৈণ হবই।

মা হাসতে হাসতে আমাকে এক ধাক্কা দিয়ে বলেন, যা, ভাগ্।

আমি বিয়ে না করলেও এখানে বড্ড জড়িয়ে পড়েছি। প্রতি-দিনে আরও বেশী জড়িয়ে পড়ছি। সিস্টার ম্যাকলীন্স্ পরামর্শ দিলেও এখানকার এতগুলো মানুষের স্নেহ-ভালবাসা উপেক্ষা করে স্বার্থপরের মত পালিয়ে যাবার কথা ভাবতেও লজ্জা হয়। না ভেবে পারি না। এই যে দিদি! একে আমি কি ভাবে উপেক্ষা করব? সামাজিক দিক থেকে কোন দায়িত্ব না থাকলেও নৈতিক দিক থেকে দিদিকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ভেবেও দিদির সমস্যার কোন সমাধান মনে আসে না। দিদি যদি শুধু অলোকবাবুর বিধবা স্ত্রী হতেন, যদি আরতি বলেই ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হত তাহলে হয়তো ডাঃ সাহানীর মত আমিও—ভাবতে গিয়েও থমকে দাঁড়াই। অপরাধী মনে হয় নিজেকে, কিন্তু না ভেবেও পারি না। এ ছাড়া তো দিদির সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। হতে পারে না। ডাঃ ঘোষের সংসারে উনি সন্তানের মর্যাদা পেলেও দু-এক বছর পর উনি যখন রিটায়ার করবেন তখন কি হবে? শুধু স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে তো মানুষের সব সমস্যা, প্রয়োজন মিটতে পারে না। দিদি কি সারা জীবন অন্যের সংসারে দাসীবৃত্তি করবেন?

সিস্টার ম্যাকলীন্‌স্-এর সংসারে দিদির মত নিষ্ঠাপরায়ণা কর্মীর অন্য সম্মান, মর্যাদা—কিন্তু উনি যদি কোন কারণে দেশে ফিরে যান তাহলে? আমাদের মত সাধারণ ভারতীয়ের সংসারে তো ওঁর কোন মর্যাদা থাকবে না। এসব সম্ভাবনার কথা ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠি। সংসারের দাসী নয়, গৃহকর্ত্রী হবার সব অধিকারই ওর আছে।

এক কথায় দিদি সুন্দরী। সাদাসিধে শাড়ি পরে, মাথায় ঘোমটা টেনে দিব্যি অনেক কিছু লুকিয়ে রাখলেও তার বসন্তের যেটুকু আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাতেই অনেকে রোমাঞ্চিত হয়। তাছাড়া দিদি উচ্চশিক্ষিতা না হলেও শিক্ষিতা। ভদ্র ও রুচিসম্পন্না। আর কি চাই? মনে মনে সব মানুষই কত কি ভাবে। আমিও ভাবি। মাঝে মাঝে দিদিকে নিয়ে সংসার করার কথা ভাবি। চোর চুরি করে আর আমি চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে স্বপ্ন দেখি, ভাবি। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়, যাকে দিদি বলে ডাকি, তাকে নিয়ে এসব স্বপ্ন দেখাও অন্যায়।

শীতকাল। ডিসেম্বরের শেষ। কলকাতার ছেলে। পুরুলিয়ার ঠাণ্ডায় হঠাৎ শরীরটা খারাপ হয়ে গেল। মহাদেব ক'দিন আগে থেকেই অসুস্থ হয়েছিল বলে দিদিই রান্নাবান্না করছিল। সেদিন হাসপাতাল থেকে এসেই শুয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি দিদি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। দিদি আমার মাথায় হাত রেখেই জিজ্ঞাসা করল, দাদা, একটু গরম দুধ খাবে?

তা একটু খেতে পারি।

দিদি সঙ্গে সঙ্গে ফ্লাস্ক থেকে গরম দুধ গেলাসে ঢেলে আমাকে দিল। দুধ খেয়েই আবার শুয়ে পড়লাম। দিদি আবার আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া শুরু করল। জিজ্ঞাসা করলাম, ক'টা বাজে?

বোধ হয় সাড়ে দশটা।

আমি চমকে উঠে বললাম, সাড়ে দশটা! তুমি কি বিকেল থেকেই আমার কাছে বসে আছ?

বিকেলের দিকে কয়েকবার যাওয়া-আসা করেছি। সোনার বাবা মা চলে যাবার পরই আমি এখানে আছি।

ওঁরা এসেছিলেন নাকি ?

হ্যাঁ। অনেকক্ষণ ছিলেন।

ওঁরা কখন গেলেন ?

সাড়ে ন'টার পর।

তুমিও এবার যাও। শুয়ে পড়।

তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমার ঘুম পায়নি।

না দিদি, তুমি এবার যাও। তোমার কাছ থেকে আর কিছু পাবার অধিকার আমার নেই।

তার মানে ?

মা বা স্ত্রী ছাড়া আর কারুর কাছে এত সেবা পাবার অধিকার থাকতে পারে না।

কেন থাকতে পারে না ? আমার কাছে এটুকু সেবা পাবার অধিকার নিশ্চয়ই তোমার আছে।

সুস্থ অবস্থায় যা বলতে পারিনি, যা শুধু মনে মনে ভেবেছি আর লজ্জায় লুকিয়ে রেখেছি, তা সে রাত্রে অসুস্থ অবস্থায় নির্বিবাদে বলে ফেললাম, তোমাকে দিদি বলে ডেকেই সে অধিকার হারিয়েছি। তা নয়তো···

দিদি জিজ্ঞাসা করল, তা নয়তো কি ?

তা নয়তো কি এখন তোমাকে যেতে বলতাম ? কোনদিনই যেতে বলতাম না।

দিদি একটু হাসল। বলল, ওসব কথা ভাবতে নেই। তাছাড়া বেশ তো আছি। আমার তো কোন কষ্ট হচ্ছে না।

এবার আমিও একটু হাসলাম। বললাম, না না, তোমার কষ্ট হবে কেন ? তুমি মহানন্দে মহাসুখে দিন কাটাচ্ছ যে !

দু-চার দিন পরে কথায় কথায় দিদিকে বললাম, আচ্ছা দিদি, সেদিন রাত্রে তোমাকে অনেক আজেবাজে কথা বলেছিলাম, তাই না ?

দিদি হাসতে হাসতে বলল, মোটেও আজেবাজে কথা বলোনি। সে রাত্রে বুঝলাম তুমি আমাকে কত ভালবাসো, কত গভীর ভাবে আমার কথা চিন্তা করো।

দিদির প্রতি আমার অসীম দরদ আর মমত্ববোধ, কিন্তু ইলা? ইদানীংকালে বাবা, মা, মীনু এখানে কদিন কাটিয়ে যাবার পর ওঁদের বাড়ির সবাই যেন কেমন পাল্টে গেছেন। ওঁরা সবাই যেন আমার কাছে আরো এগিয়ে এসেছেন। সোনার মা দুই মেয়েকে নিয়ে আমার সঙ্গে গল্পসল্প করতে করতে একদিন হঠাৎ বললেন, আপনি আমার চাইতে অনেক ছোট। তাছাড়া আপনার মাকে যখন দিদি বলি তখন আপনাকে আপনি বলতে সত্যি কেমন অস্বস্তি লাগে। আমি আর আপনি বলব না কিন্তু।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, নিশ্চয়ই বলবেন না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সোনার মা বললেন, বাঁচালে।

পরের দিন ইলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি যেন তোমাদের বাড়ির সবার কাছে একটু বেশি প্রিয় হয়ে উঠেছি। কি ব্যাপার বলতে পারো?

আপনাকে যদি ওদের ভাল লাগে, তাহলে আমি কি করতে পারি?

আমি কিছু করতে বলছি না, শুধু কারণটা বলতে বলছি।

ইলার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, মা'র ধারণা আপনার মত আদর্শবান সৎ ছেলে নাকি আজকাল আর পাওয়া যায় না।

আমি হাসি। জিজ্ঞাসা করি, আবহাওয়া এরকম হঠাৎ পাল্টে গেল কেন?

ওসব আমি জানি না।

ইলা স্বীকার না করলেও ওর মুখের চাপা হাসি, চোখের কোণে ঈষৎ রহস্যের ইঙ্গিত দেখে মনে হয় ও সব কিছুই জানে। হয়তো চাপাচাপি করলে বলত কিন্তু কোন ব্যাপারেই বেশি আগ্রহ দেখানো আমার স্বভাব নয়। আমি জানি এই পৃথিবীর কোন রহস্যই বেশিদিন

গোপন থাকতে পারে না। একদিন না একদিন সব রহস্যকেই প্রকাশিত হতে হয়। বললাম, কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে। আজ না হোক, কাল না হোক পরশু ঠিকই জানতে পারব।

তা তো বটেই।

*　　*　　*

দূরের অযোধ্যা পাহাড়ের চেহারা একটুও পাল্টায়নি। সময়ের স্রোতের কোন ছাপ পড়েনি ওর কোথাও, কিন্তু আমরা, যারা অযোধ্যা পাহাড়ের মত কালজয়ী নই তাদের সবার উপর সময়ের স্রোত ছাপ ফেলবেই। মুক্তির কোন পথ নেই। শুধু আমি বা আমরা কেন, দেখতে দেখতে হাসপাতালের চেহারাটা কত পাল্টে গেল। শুনেছি শিবনাথ শৈশবে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। অতিক্রম করল কৈশোর। ছুটি পেল যৌবনের মুখোমুখি। এই ক'বছরে শুধু রোগমুক্ত হল না, মুক্ত হল বাবা-মার স্নেহ থেকে। বাবা-মা'র অবর্তমানে দাদার সংসারে ঠাঁই হল না শিবনাথের।

সূর্য অস্ত গেলেও সূর্যের আলো তখনও হারিয়ে যায়নি। হাসপাতালের সামনে রেভারেণ্ড ঘোষ ছোট্ট একটা বাইবেল হাতে নিয়ে পায়চারি করছিলেন। দূর থেকে শিবনাথকে ফিরে আসতে দেখেই উনি এগিয়ে গেলেন। দীর্ঘ দুটো হাত প্রসারিত করতেই শিবনাথ কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে ওঁকে জড়িয়ে ধরল। রেভারেণ্ড ঘোষ ওর চোখের জল মুছিয়ে ওর কপালে একটা স্নেহচুম্বন দিলেন। বললেন, এত কাল তোর হাত ধরে পায়চারি করে আজ আর কিছুতেই ভাল লাগছিল না। বাইবেল পড়েও মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না।

হাসপাতালের বাইরে, আউটডোরের পাশেই শিবনাথ চায়ের দোকান করেছে। রোজ ভোরবেলায় শিবনাথের দোকানের প্রথম কাপ চা খেয়েই রেভারেণ্ড ঘোষ দিন শুরু করেন। ডাঃ সাহানী প্রায়ই বৌদিকে বলেন, তোমরা কি কেউ শিবনাথের মত চা বানাতে পারো না?

বৌদি স্বামীর প্রশ্নের জবাব দেন আমাকে, বলুন তো ভাই,

শিবনাথ কি আমাদের মত দুধ-চিনি দিয়ে চা বানায়? ওর চায়ে আরো যা কিছু থাকে তা তো আমরা কোনদিনই দিতে পারব না।

কত নতুন রুগী এসেছেন। পুরনো রুগীদের মধ্যেও কয়েকজন ছাড়া পেয়েছেন। বংশী ছুটি পেয়েছে। গ্র্যাণ্ড মাম্‌মা জোসেফের সঙ্গে ব্যাঙ্গালোর ফিরে গিয়েছেন। মেজদিও নেই। আমার মা দুর্গার ছুটিও আসন্ন। ওর দেড়খানা পা আবার দু'খানা হয়ে গেছে। নকল পা দিয়ে বেশ হাঁটাহাঁটি করতে পারে। ডাঃ সাহানী অপারেশন করে ওর আঙুলগুলো ঠিক করে দিয়েছেন।

হাসপাতালে আমার ঘরে বসে কয়েকজন পেসেন্টের ব্যাকটিরিও-লজিক্যাল রিপোর্ট পড়ছিলাম। হঠাৎ হাসতে হাসতে নাচনী ছুটে এসে বলল, আমি চললাম।

আমি চমকে উঠলাম। বললাম, কোথায়?

নাচনী কোমর দুলিয়ে বলল, বড ডাক্তারবাবু বললেন আমার ছুটি।

খবরটা শুনে খুশি হলাম। মনে মনে বললাম, নাচনী, শুধু তোর কেন, হাসপাতালের সব রুগীর ছুটি হয়ে যাক, তাহলে আমি আরো খুশি হব। জিজ্ঞাসা করলাম, আজই তোর ছুটি হল?

আজ না, শনিবার হবে। ঠোঁট বেঁকিয়ে নাচনী বলল, সেদিন তোমাকে কলা দেখিয়ে গঞ্জুর মোটরে চড়ে চলে যাব।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর আমাকে কবে নিয়ে যাবি?

কদিন গঞ্জুর সঙ্গে কাটাই, একটু ভাল-মন্দ খেয়েদেয়ে শরীরে একটু জেল্লা আনি, তারপর তোমাকে নিয়ে যাব। মিট মিট করে হাসতে হাসতে ও বলল, কত দিন গঞ্জু আমাকে কাছে পায় না বল তো?

সে তো আমি জানি, কিন্তু গঞ্জুর কাছে গিয়ে তুই আমাকে ভুলে যাবি না তো?

নাচনী চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে বলল, কি! আমার নাচ দেখতে বুঝি তোমার খুব ইচ্ছে করছে?

আমি দু'হাতের উপর মুখখানা রেখে বললাম, তোর সঙ্গে আমার এত ভাব, আর তোর নাচ দেখতে ইচ্ছে করে না ?

নাচ তো দূরের কথা, আমি সেজেগুজে যখন তোমার সামনে এসে দাঁড়াব তখনই তোমার মাথা ঘুরে যাবে। বুঝলে ?

* * *

হাসপাতাল থেকে বেরুবার সময় চ্যাটার্জী অফিস থেকে বেরিয়ে এসে একটা চিঠি দিল। ঠিকানা লেখা দেখেই বুঝলাম মা'র চিঠি। সঙ্গে সঙ্গে খুলে পড়তে শুরু করলাম। কি ? মিনুর বাচ্চা হবে ? মনে হল এই তো সেদিন মীনুর বিয়ে হল—কিন্তু এরই মধ্যে দেড় বছর পার হয়ে গেল ?

চিঠিটা পড়তে পড়তেই হাঁটছিলাম কিন্তু হঠাৎ থমকে না দাঁড়িয়ে পারলাম না। 'মীনুর ইচ্ছা দু-এক মাসের মধ্যেই তোর বিয়ে হয়। কারণ এরপর ওর শরীর খারাপ হয়ে পড়বে এবং ওর পক্ষে বিয়েতে আনন্দ করা মুশকিল হবে। মেয়ে দেখা হয়ে গেছে। আমাদের সবারই মেয়েটিকে খুব ভাল লেগেছে। ওদের পরিবারটিও ভারী সুন্দর। মীনু বলছিল মেয়েটির সঙ্গে তোর আলাপ-পরিচয় আছে। সে যাই হোক আমি স্থির জানি যে মেয়েটিকে তোর ভাল লাগবেই।' হাঁটতে হাঁটতে অবাক হয়ে ভাবছিলাম মা'র চিঠির কথা। বিয়ের বয়স নিশ্চয়ই আমার হয়েছে। আটাশ বছর বয়স হল। মীনুর বিয়ের ঝামেলা না থাকলে হয়তো মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ে হত—কিন্তু কার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক হল ? আমার সঙ্গে তার আলাপ আছে ! তবে কি মেডিক্যাল কলেজেরই কোন প্রাক্তন ছাত্রীর সঙ্গে ওঁরা আমার বিয়ে দিচ্ছেন ? মাত্র দুটি মেয়ের সঙ্গে আমার একটু ভাব ছিল। এক সুমিত্রা রায় আর মালতী। মালতীর বিয়ে হয়ে গেছে আর সুমিত্রা এম. আর. সি. পি. পড়তে বিলেত গেছে। মাসখানেক আগে ওর চিঠি পেয়েছি। লিখেছিল মাসখানেকের মধ্যেই রেজাল্ট বেরুবে এবং পাস করলে হয়তো চাকরি নিয়ে কানাডায় চলে যাবে। সুতরাং ওর সঙ্গে বিয়ে হবার কোন

সম্ভাবনা দেখছি না। তবে?

বীণা নয় তো? বিজুদের সঙ্গে আমাদের যা ঘনিষ্ঠতা তাতে এ রকম একটা কিছু হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু বীণাকে স্ত্রী হিসেবে ভাবতেও কেমন লাগে!

এছাড়া দিদি আর ইলার সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ-পরিচয় আছে। দিদি আলোচনার ঊর্ধ্বে। তবে কি ইলা?

চিঠিটা হাতে করে আনমনে এইসব ভাবতে ভাবতে আমার কোয়ার্টার পার হয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সোনার মা ডাকলেন, কি অজয়? কোথায় যাচ্ছ?

একটু লজ্জিত হয়ে বললাম, না না, কোথাও যাচ্ছি না।

তোমাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে যেন?

মা'র চিঠি এসেছে। তাই ভাবছিলাম···

ওঁরা ভাল আছেন তো?

হ্যাঁ।

মীনুর তো বাচ্চা হবে শুনলাম। ও কেমন আছে?

প্রশ্নটা শুনেই অবাক হলাম। আমি আজই জানলাম মীনুর বাচ্চা হবে আর ওঁরা আগেই সে খবর জেনেছেন? বুঝলাম মা ওঁকে চিঠি লেখেন। অথবা মীনুই ইলাকে জানিয়েছে। ইলার সঙ্গে তো ওর খুব ভাব হয়েছে। সবচাইতে আগের বন্ধুরাই এসব খবর জানতে পারে। বললাম, মীনুও ভালই আছে।

যাও, খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম কর।

কোয়ার্টারে এলাম। স্নান করলাম। খেলাম। পিঠে দুটো বালিশ দিয়ে বিছানায় বসে বসেও ভাবছিলাম মা'র কথা, মীনুর কথা, সোনার মা'র কথা। নানা কথা ভাবতে ভাবতে মনে হল তাহলে কি ইলার সঙ্গেই আমার বিয়ে হচ্ছে নাকি?

একটু পরেই দিদি এল। বলল, কি দাদা, তুমি শোবে না?

না, আজ আর ঘুম পাচ্ছে না।

একটু ঘুমোও। তা নয়তো বিকেলে খুব ক্লান্ত বোধ করবে।

একটা মোড়া টেনে নিয়ে পাশে বসতে বসতে দিদি জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি ভাবছ বল তো ?

একটু হাসলাম। একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, জানো দিদি, শনিবার নাচনীর ছুটি হবে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

কিন্তু ওকে কি গঞ্জু নিতে আসবে ?

হাসপাতাল থেকে খবর তো দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ডাঃ সাহানীর ধারণা কেউ ওকে নিতে আসবে না।

দিদি খুব জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমার তাই মনে হয় কিন্তু এই কাঁচা বয়সে হতভাগিনী যে কার হাতে গিয়ে পড়বে তা কে জানে !

ডাঃ সাহানীরও ঐ একই চিন্তা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। তারপর বালিশের নীচে থেকে মা'র চিঠিটা বের করে দিদিকে দিলাম, মা'র চিঠি। পড়।

চিঠিটা পড়ে দিদি হাসতে হাসতে বলল, তুমি তাহলে মামা হচ্ছ ?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, শুধু মামা না, আরো কিছু হচ্ছি।

তাই তো।

দিদি যতটা আশ্চর্য হবে ভেবেছিলাম, তা হল না। একবার সন্দেহ হল, দিদি আমাকে নিয়ে মনে মনে কোন স্বপ্ন দেখেনি তো ? কিন্তু কোনদিন তো সে রকম কোন আভাস বা ইঙ্গিত পাইনি ? নাকি দিদিও সব কিছু জানে ? মা বা মীনু ওকেও কিছু জানিয়েছে নাকি ?

* * *

শনিবার সকালবেলায় হাসপাতালে গিয়ে দেখি নাচনী সাজগোজ করে গঞ্জুর মোটরের জন্য সামনের বারান্দায় বসে আছে। বললাম, এত সকালে কি কেউ অত দূর থেকে আসতে পারে ?

নাচনী আমার কথা গ্রাহ্যই করল না। বলল, যাও যাও, ডাক্তারী করগে যাও।

হাসপাতালের ডিউটি শেষ করে বেরুবার সময়ও দেখলাম ও ঠিক আগের মতই পথের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। বলল হাঁ করে কি দেখছ? পথে নিশ্চয়ই মোটরে গণ্ডগোল হয়েছে তাই গঞ্জুর দেরি হচ্ছে।

সন্ধ্যাবেলায় খবর নিতে গিয়ে জানলাম রেভারেণ্ড ঘোষের কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়ে নাচনী বাসে করেই গঞ্জুর ওখানে চলে গেছে।

এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল। সেদিন ডিউটির শেষে ডাঃ সাহানীর ঘরে বসে চা খাচ্ছিলাম। চা খেতে খেতে উনি বললেন, মনে হচ্ছে নাচনীর কপালটা ভালই।

আমারও তাই মনে হয়।

হাসপাতাল থেকে এসে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল মহাদেবের ডাকাডাকিতে। একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, কি রে? এত ডাকাডাকি করছিস কেন?

নাচনী এসেছে।

নাচনী!

হ্যাঁ। পাশের ঘরে বসে আছে।

তাড়াতাড়ি উঠে ও-ঘরে যেতেই নাচনী আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল, তুমি আমাকে একটু থাকতে দাও ডাক্তারবাবু। আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিও না।

কেন? গঞ্জু নিল না?

কাঁদতে কাঁদতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, না ডাক্তারবাবু, কেউ আমাকে নিল না। এতদিন ধরে কতজনের কাছে ঘুরলাম, কতজনকে নাচ দেখালাম, গান শোনালাম কিন্তু কেউ আমাকে রাখল না। তারপর আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না ডাক্তারবাবু। আমার আর কেউ নেই।

আমি পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলাম। নাচনী উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি তো বিয়ে করোনি ডাক্তার-বাবু আমি তোমার নাচনী হয়ে থাকব। তুমি তো আমার নাচ

দেখতে চেয়েছিলে। দেখবে আমার নাচ।

আমার অজান্তেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল কিন্তু একটি কথা বলতে পারলাম না। নাচনী কাপড়-চোপড় ঠিক করে কাঁদতে কাঁদতেই কোমর দুলিয়ে নাচতে শুরু করল। আমি কিছু বলতে পারলাম না। খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে হাঁপাতে হাঁপাতে নাচনী বলল, দেখছ ডাক্তারবাবু! আমি কি সুন্দর নাচতে পারি! গান শুনবে? শোন—

তুমি আমার ফুলাম তেল, তুমি আমার মন ভেলা
তুমি আমার আয়না চিরুনি গো…

আমার চোখের সামনে শুধু অন্ধকার। দেখতে পারছি না নাচনী আসার খবর শুনে দিদি এসেছে, সোনার মা আর দুই দিদিও এসেছেন।

হঠাৎ গান থামিয়ে নাচনী হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকে আমি খুব আদর করব, খুব ভালবাসব। তুমি আমাকে…

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। ধাক্কা দিয়ে নাচনীকে ঠেলে ফেলে দিয়েই পাগলের মত চিৎকার করে উঠলাম, গেট আউট!

ইলা কাঁদতে কাঁদতে আমার সামনে এসে বলল, দুদিন পরে এ সংসারটা আমারই হবে। আমি বলছি নাচনী থাকবে।

দিদি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে দু'হাত দিয়ে নাচনীকে জড়িয়ে বলল, ওঠ্, নাচনী ওঠ্। খাওয়া-দাওয়া করবি চল্।

—শেষ—